ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً-

উচ্চারণ: ওয়া ইজ-ক্বা-লা রাব্বুকা লিল মালা-ই কাতি ইন্নি-জ্বা-ইলুন ফিল আরদি খালীফাহ (সুরা বাকারা, আয়াত-৩০)

অর্থ: মহান আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাদেরকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি বা খলিফা সৃষ্টি করতে চাই। (সুরা বাকারা, আয়াত-৩০)

মহান আল্লাহতায়ালাকে পাওয়ার ও নিজের আত্মার মুক্তির একমাত্র উপায়ই

উসিলা

WASEELA

শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ
নক্‌শবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

بسم الله الرحمن الرحيم

মহান আল্লাহতায়ালাকে পাওয়ার ও নিজের আত্মার মুক্তির একমাত্র উপায়ই

উসিলা

WASEELA

শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ

নক্শবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

কুতুববাগ প্রকাশনী

সদর দপ্তর: ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

ফোন: ০০৮৮-০২৫৮-৮১৫৬৫২৮

Website: www.kutubbaghdarbar.org.bd

শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ
নক্‌শবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী পীর কেবলাজান

খাজাবাবা কুতুববাগী পীর কেবলাজানের মহামূল্যবান নছিহত বাণী

অজ্ঞাত ও অদৃশ্য বস্তু দেখা ও নূর দর্শন করা মারেফাতের মূল উদ্দেশ্য নয়। চারটি বিষয় লাভ করাই তরিকার মূল উদ্দেশ্য।

১। জমিয়ত অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন মনকে একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার চিন্তার দিকে নিয়োজিত করা।

২। হুজুরী অর্থাৎ মহান আল্লাহতায়ালাকে হাজের (সর্বত্র বিরাজমান), নাজের (সর্বদর্শী) মনে করবার ক্ষমতা অর্জন করা।

৩। জজবাত অর্থাৎ মহান আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে মন সর্বদা আকর্ষিত হওয়া।

৪। ওয়ারেদাত অর্থাৎ মহান আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে অতি নূর তাজাল্লির ফায়েজপ্রাপ্ত হওয়া।

মুরিদের জন্য এই চারটি কার্য অতি আবশ্যক

১। নির্জনতা
২। নির্বাক অবস্থা
৩। ক্ষুধা সহ্য করা
৪। অনিদ্রা অভ্যাস করা

কুতুববাগী পীর কেবলাজানের ১৩ বছর বয়সের ছবি

কুতুববাগী পীর কেবলাজানের
১৩ বছর বয়স থেকে সাধনা শুরু

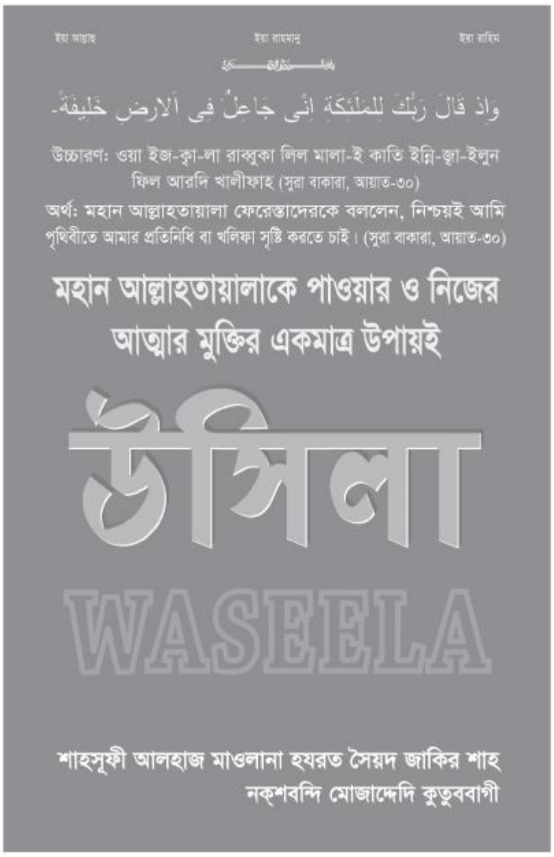
وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً۔
উচ্চারণ: ওয়া ইজ-ক্বা-লা রাব্বুকা লিল মালা-ই কাতি ইন্নি-জ্বা-ইলুন ফিল আরদি খালীফাহ (সুরা বাকারা, আয়াত-৩০)
অর্থ: মহান আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাদেরকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি বা খলিফা সৃষ্টি করতে চাই। (সুরা বাকারা, আয়াত-৩০)
মহান আল্লাহতায়ালাকে পাওয়ার ও নিজের আত্মার মুক্তির একমাত্র উপায়ই
উসিলা
WASEELA
শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ
নক্শবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

কুতুববাগ প্রকাশনী

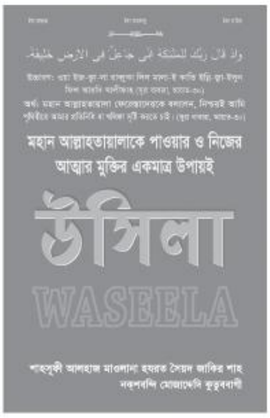

গ্রন্থস্বত্ব ঃ পীরজাদী মোসাম্মৎ খাজা সৈয়দা জহুরা খাতুন তাসনিম

প্রকাশকাল ঃ ১০ মহররম ১৪৪০ হিজরী, ৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ,
২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সাল

প্রকাশনী ঃ কুতুববাগ প্রকাশনী
সদর দপ্তর: ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০০৮৮-০২৫৮-৮১৫৬৫২৮
Website: www.kutubbaghdarbar.org.bd

প্রচ্ছদ ঃ মাওলানা মতিউর রহমান এসলাহী আল-মোজাদ্দেদি
বড়ধূল, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

বর্ণবিন্যাস ঃ মোহাম্মদ বিননূর হাসান অরূপ আল-মোজাদ্দেদি, বিএ অনার্স (বিটিএইচএম)
শিমুলিয়া, পত্নীতলা, নওগাঁ, খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

মুদ্রণ ঃ কুতুববাগ প্রিন্টিং প্রেস
সদর দপ্তর: ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০০৮৮-০২৫৮-৮১৫৬৫২৮

প্রাপ্তিস্থান ঃ কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া লাইব্রেরী
সদর দপ্তর: ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

হাদিয়া ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

পীরজাদা হযরত খাজা সৈয়দ গোলাম রাব্বানী
(রহঃ) আল-মোজাদ্দেদি
(যাঁর মাজার শরীফ নারায়ণগঞ্জ, বন্দর কুতুববাগ দরবার শরীফে অবস্থিত)

পীরজাদা হযরত খাজা সৈয়দ গোলাম রহমান
(রহঃ) আল-মোজাদ্দেদি
এবং
পীরজাদী খাজা হযরত সৈয়দা জয়নব (রহঃ আঃ)
(যাঁদের মাজার শরীফ নারায়ণগঞ্জ, বন্দর, কলাগাছিয়া, শুভকরদী গ্রামে অবস্থিত)

সূচিপত্র

১। কুতুববাগী পীর কেবলাজানের তরিকা ও খেলাফত হাসিলের শাজারা মোবারক -------------------- ০৫

২। লেখক পরিচিতি --------------------------------- ০৭

৩। ভূমিকা -- ০৯

৪। মহান আল্লাহতায়ালাকে পাওয়ার ও নিজের আত্মার মুক্তির একমাত্র উপায়ই উসিলা ----------------- ১০

৫। কোরআন হাদিস মতে তর কা গ্রহণ করার গুরুত্ব - ৪৮

৬। যুগে যুগে সত্যকে জানার জন্য প্রত্যেকেই কামেল মোর্শেদ বা গুরুর কাছে বাইয়াত, শিক্ষা-দীক্ষা ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন -------------------------- ৫৮

৭। মহান আল্লাহতায়ালার জিকিরের গুরুত্ব ---------- ৬৪

৮। দরুদ শরীফ ছাড়া মহান আল্লাহতায়ালা কোনো ইবাদতই কবুল করেন না ---------------------- ১০১

শাজারা মোবারক

ঢাকার ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফের পীর-মুর্শিদ শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নক্‌শবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের নক্‌শবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার খেলাফত হাসিলের শাজারা মোবারক

১. সরওয়ারে কায়েনাত মোফাখ্‌খারে মউজুদাদ হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)
২. আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)
৩. হযরত সালমান ফারছী (রাঃ)
৪. হযরত কাশেম ইবনে মোহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)
৫. হযরত জাফর সাদেক (রাঃ)
৬. হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৭. হযরত আবুল হোসেন খেরকানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৮. হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৯. হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রঃ)
১০. হযরত খাজায়ে খাজেগান আব্দুল খালেক আজদেদানী (রঃ)
১১. হযরত খাজা মাওলানা আরীফ রেওগিরী (রঃ)
১২. হযরত খাজা মাহামুদ আনজীর ফাগনবী (রঃ)
১৩. হযরত শাহ্ আজীজানে আলী আর্‌রামায়েতানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৪. হযরত খাজা মাওলানা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৫. হযরত শাহ্ আমীর কালাল (রঃ)
১৬. শামছুল আরেফীন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (রঃ)
১৭. হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রঃ)
১৮. হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ)

১৯. হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (রঃ)

২০. হযরত শাহসূফী জাহেদ আলী (রঃ)

২১. হযরত শাহ্ দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ)

২২. হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজেগী এমকাঙ্গী (রঃ)

২৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (কুঃ ছিঃ আঃ)

২৪. ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামানী, গাউছে ছামাদানী, হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফে ছানী (রঃ)

২৫. হযরত শেখ সৈয়দ আদম বিননূরী (কুঃ ছিঃ আঃ)

২৬. হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী (রঃ)

২৭. হযরত মাওলানা শেখ আব্দুর রহিম মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)

২৮. হযরত মাওলানা শাহ্ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)

২৯. হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (কুঃ ছিঃ আঃ)

৩০. হযরত শাহ্ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (কুঃ ছিঃ আঃ)

৩১. হযরত শাহসূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)

৩২. হযরত মাওলানা শাহসূফী ফতেহ্ আলী ওয়ায়েসী রাসূলে নোমা (রঃ)

৩৩. হযরত মাওলানা শাহসূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ)

৩৪. হযরত মাওলানা শাহসূফী সৈয়দ খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী নক্শবন্দি মোজাদ্দেদি (কুঃ ছিঃ আঃ)

৩৫. মোজাদ্দেদে জামান, শাহেনশাহে তরিকত, হযরত মাওলানা আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী নক্শবন্দি মোজাদ্দেদি (রঃ)

৩৬. শাহেনশাহে তরিকত, মোফাসসিরে কোরআন, আলহাজ মাওলানা শাহসূফী কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলী নক্শবন্দি মোজাদ্দেদি (কুঃ ছিঃ আঃ)

৩৭. আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মোজাদ্দিদে জামান, খাজাবাবা শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নক্শবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী (মাঃ জিঃ আঃ)

লেখক পরিচিতি

খাজাবাবা শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, যুগের শ্রেষ্ঠতম হেদায়েতের হাদি বর্তমান জামানার সর্বশ্রেষ্ঠ বেলায়েতের অধিকারী জামানার মধ্যহৃ ভাস্কর, এই জামানার খোদাপ্রাপ্তি তত্বজ্ঞান হাসিলের আধার পথের দিশারী, বর্তমান জামানার সত্য পথের মোজাদ্দিদ, দয়াল পীর দস্তগীর আরেফে কামেল হাদিয়ে গা হেদায়েতের নূর মহিউস সুন্নাহ্ মহিউল ক্বলব বিশ্বব্যাপী সূফীবাদের মহাপ্রচারক শাহান শাহে কুতুববাগী পীর কেবলাজান হুজুরের পবিত্র আঙ্গুলীর দ্বারা ক্বালবের ছবকে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে মহান আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর এশ্‌ক মোহাব্বত পয়দা হচ্ছে, নাপাক দিল পাক হচ্ছে, অন্ধকার দিল আলোকিত হচ্ছে, আল্লাহভোলা দিলে আল্লাহ! আল্লাহ! জিকির জারি হচ্ছে। যার ইত্তেহাদি তাওয়াজ্জুহ্ বলে কত কুফরী দিলের ময়লা কাটিয়া আয়নার ন্যায় পরিস্কার হচ্ছে। আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে দিল রওশন হচ্ছে, দিলে গওহর পয়দা হচ্ছে।

হুজুর কেবলাজান সাহেবের পিতার নাম মুন্সি মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মাতার নাম মোসাম্মৎ হালিমা খাতুন। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার অন্তর্গত কলাগাছিয়া ইউনিয়নের শুভকরদী গ্রামে এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু বয়সেই হুজুর কেবলাজান মাতৃহারা হন। কেবলাজান হুজুরের মা ইন্তেকালের পর তাঁর চাচীমা-অপরিসীম স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে অতি যত্নসহকারে এই তাপসকে লালন-পালন করেন।

কেবলাজান হুজুরের বয়স যখন আট বছর তখন চাঁদপুর জেলার দরবেশগঞ্জের স্বনাম ধন্য আলেম মাওলানা মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। এরপর তাফসির ও হাদিস শাস্ত্র বালাগাত মানতেক অন্যান্য মাসলা-মাসায়েল এর উপর অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। কেবলাজান হুজুরের বিনয় ও আদব দেখে তাঁর ওস্তাদ ভবিষ্যৎ বাণী করলেন- এই ছেলে একদিন জগৎ বিখ্যাত অলিয়ে কামেল হবে। বাংলা- ভারতের আধ্যাত্মিক

জগতের মহাসাধক মহাগুরু মহাত্মা খাজা ইউনূস আলী এনায়েতপুরীর মেজ সাহেবজাদা শাহসূফী আল্লামা খাজা সাইফুদ্দীন শম্ভুগঞ্জী ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন- এই তাপস একদিন রাসুল (সাঃ)-এর সত্য তরিকা প্রচারের মহা আন্দোলন সৃষ্টি করবেন। তাঁর উসিলায় তামাম দুনিয়ায় এই তরিকা প্রচার হবে। খাজা এনায়েতপুরীর চতুর্থ সাহেবজাদা খাজা মোজাম্মেল হক শ্যামলীবাগী এনায়েতপুর দরবার শরীফের মসজিদের পেশ ইমাম কারী ইদ্রিস সাহেবকে লক্ষ্য করে বলেন, কুতুববাগী হুজুর কেবলাকে নিয়ে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেন তা এই তাপসের কাছ থেকে রাসুল (সাঃ) এর ঘ্রাণ পাইতেছি এবং উনার দ্বারা সারা দুনিয়ায় রাসুল (সাঃ) এর তরিকা প্রচার হবে।

কেবলাজান হুজুরের জ্ঞান পিপাসা না মেটার ফলে তিনি তাঁর শিক্ষাকে আরো অগ্রসর করতে ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাই তিনি বিভিন্ন অলি-আল্লাহর সোহবতে যান এবং ধৈর্য্য ও যত্নের সাথে আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন করেন, চার তরিকার অজিফা আমলের উপরে তরিকতের দায়রার এলেম জিকিরের ছুলুক ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

বিশ্ব বিখ্যাত মোফাস্‌সিরে কোরআন, মোহাদ্দেসে আকবার, মুফতিয়ে আজম, আলেমে হক্কানি, আলেমে রব্বানী শাহসূফী আলহাজ মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খাঁন মাতুয়াইলী (রহঃ) এর কাছে বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দরবারে মোজাদ্দেদিয়ায় কেবলাজান হুজুর ১১ বৎসর গোলামী করে খেলাফত হাসিল করেন।

এরপর আপন পীরের নির্দেশে তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বন্দর থানায় তাঁর পীরের নামানুসারে কলাগাছিয়া ইউনিয়ন শুভকরদী গ্রামে ৩০ বছর আগে (১৯৮৮ ইং সালে) কুতুববাগ খানকা শরীফ প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বীয় পীরের নির্দেশে, বন্দর থানাধীন সাবেক রেলস্টেশন সংলগ্ন কুতুববাগ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন। রাসূল (সাঃ) এর সত্য তরিকা প্রচার বিস্তার করার জন্য ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার কানিহাড়ী ইউনিয়নে আহম্মদবাড়ীতে আরেকটি দরবার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকার ফার্মগেট ৩৪ ইন্দিরা রোড সদর দপ্তরে কুতুববাগ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে বিদেশে সর্বস্তরের মানুষের কাছে মহান আল্লাহতায়ালার মনোনীত ইসলাম ও দয়াল নবীজীর সত্য তরিকা সূফীবাদের বাণী প্রচারের লক্ষ্যে বিরামহীন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগৎ - কুল কায়েনাতের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, লালনকর্তা-পালনকর্তা এবং অতি দয়ালু ও ক্ষমাকারী। সেই মহান আল্লাহ তায়ালাকে চর্মচোখে দেখা মানব ও জ্বিন জাতির পক্ষে সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ও প্রিয়পাত্র না হতে পারলে পরকালে আমাদের মুক্তির কোন রাস্তা নেই। সেই মুক্তির রাস্তার সন্ধান না পেলে আমাদের জনম নিরর্থক। মহান আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র হতে হলে একনিষ্ঠভাবে করতে হবে তাঁর এত্তেবা ও অনুসরণ। ভালবাসতে হবে তাঁকে মনপ্রাণ উজাড় করে দিয়ে। কোরআন শরীফে ও মহানবী (সা:) আমাদের সে শিক্ষাই দিয়েছেন। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের স্রষ্টা তাঁর সঙ্গে নিগুঢ় মহব্বতের বন্ধন স্থাপন করতে ইবাদত, বন্দেগী, প্রার্থনা প্রভৃতির মাধ্যমেই যোগসূত্র স্থাপন করা অপরিহার্য।

বর্তমান কিছু সংখ্যক মানুষের কোরআন-হাদিসের নানান রকম ভুল ব্যাখ্যা ও ভুল মতভেদের কারণে মহান আল্লাহতায়ালকে পাওয়ার জন্য কোন মধ্যস্থতা বা উসিলার প্রয়োজন নেই বলে থাকে। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা কোরআন-হাদিসে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এবং আউলিয়াগণের মাধ্যমে তাঁকে পাওয়ার জন্য মধ্যস্থতা বা উসিলা অন্বেষণ করার শিক্ষা দীক্ষার ব্যাবস্থা অব্যহত রেখেছেন।

এই কিতাবে উভয় পক্ষের মতের পর্যালোচনা করে কোনটা আসলেই সিরাতুল মুস্তাকিম তার সন্ধান তুলে ধরছি। আশা করি সাধারণ মানুষ এতে সঠিক সরল পথের দিশা বা পথ পাবেন এবং তাদের মতের দ্বিধা দ্বন্দ্বের সমাধান পাবেন, ইনশাল্লাহ।

মহান আল্লাহতায়ালাকে পাওয়ার ও নিজের আত্মার মুক্তির একমাত্র উপায়ই উসিলা

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّى جَاعِلٌ فِى الاَرضِ خَلِيفَةً ط قَالُو اَتَجعَلُ فِيهَا مَن يُفسِدُ فِيهَا

وَيَسفِكُ الدِّمَاءَ ج وَنَحنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّى اَعلَمُ مَا لاَ تَعلَمُونَ-

উচ্চারণ: ওয়া ইজ-ক্বা-লা রাব্বুকা লিল মালা-ই কাতি ইন্নি-জ্বা-ইলুন ফিল আরদ্বি খালীফাহ: ক্বালূ আতাজ্বয়ালূ ফিহা মাই ইয়ুফসিদু ফীহা অইয়াসফিকুদ দিমা-আ, ওয়া নাহনু নুসাব্বিহু বিহাম্‌দিকা অনুকাদ্দিসু লাক; ক্বালা ইন্নী আ'লামু মা-লা -তা লামুন। (সুরা বাকারা, আয়াত-৩০)

অর্থ : যখন মহান আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা বানাতে চাই, (তোমাদের মতামত কী?) তখন ফেরেস্তারা বললেন, হে দয়াময় আল্লাহতায়ালা, এমন প্রতিনিধি বানালে, যিনি দুনিয়াতে গিয়ে খুনখারাবি-মারামারি হানাহানি অশান্তি করে আপনার নামের কলঙ্ক করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। আমরা তো যথেষ্ট পরিমাণ আপনার তাসবীহ-জিকির প্রশংসা ও পবিত্র গুণের বর্ণনা করছি। আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাদের সাবধান করে বললেন- হে ফেরেস্তারা, নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।

'তাফসীরে মাযহারী'তে আরো বলা আছে, খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধি হচ্ছেন, হযরত আদম (আঃ)। তাঁকে খলিফা হিসেবে প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহতায়ালার বিধানাবলী ও বিধান অনুসারে বিষয়ের প্রচলন, পথ-প্রদর্শন, সত্যের পথে আহ্বান, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং মহান আল্লাহতায়ালার প্রকাশ-বিকাশ হওয়ার ইচ্ছা বা মাধ্যম। কারণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু সৃষ্টিকুল তাঁর মুখাপেক্ষী। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্যই তিনি প্রতিনিধি পাঠানোর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ, সাধারণ মানুষ আল্লাহতায়ালার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে এবং সরাসরি আল্লাহতায়ালার আদেশ বা ঐশী বাণীর মাধ্যমে পাঠানো বিধান গ্রহণ করতে অক্ষম। তাই পরম দয়ালু আল্লাহ এই প্রতিনিধিত্বের পরস্পর শুরু করার অভিপ্রায় বা ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন হযরত আদম (আঃ) এর মাধ্যমে।

وَلَو اَنَّهُم اِذ ظَّلَمُوا اَنفُسَهُم جَاءُوكَ فَاستَغفَرُوا اللهَ وَاستَغفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

উচ্চারণ: ওয়ালাও আন্নাহুম ইয যালামু আন ফুসাহুম জ্বাউকা ফাসতাগফারুল্লাহ ওয়াসতাগফারা ওলাহুমুর রাসুলু লাওয়াজ্বাদু-ল্লাহা তাওয়্যা বার রাহিমা (সুরা নিসা, আয়াত-৬৪)

অর্থ : যদি এ সকল লোক নিজেদের আত্মাসমূহ ও নফসের ওপর জুলুম করে, হে নবী (সাঃ) আপনার দরবারে এসে হাজির হয়ে যায় এবং আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবায়ে নাছুহা করে এবং আপনি (ইয়া রাসুলুল্লাহ সাঃ) তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে এরা আমি আল্লাহকে তওবা কবুলকারী, ক্ষমাকারী মেহেরবান হিসেবে পাবে। এ আয়াতে কারিমা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল হুজুর (সাঃ) প্রত্যেক গুনাহ্গারের জন্য সর্বসময় কিয়ামতাবধি মাগফিরাতের উসিলা।

يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وابتَغُوا الَيهِ الوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوْا فِى سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ.

উচ্চারণ:"ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াবতাগু এলাইহিল উসিলাতা ওয়া যাহেদু ফি ছাবিলিহি লায়াল্লাকুম তুফ্লেহুন।" (সুরা মায়েদা ৬ রুকু ৩৫ আয়াত)

অর্থাৎ- আল্লাহতায়ালা ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ঘোষণা করেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তায় উসিলা অন্বেষণ বা তালাশ কর এবং এ পথে জেহাদ কর অর্থাৎ কঠোর রিয়াজত সাধনা এবং নিজের নফসের সাথে জিহাদ কর, যেন তোমরা মুক্তি লাভ করতে পার।"

উসিলা শব্দের অর্থ মধ্যস্থ ব্যক্তি, কোন বিষয়ের মীমাংসাকারী, মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে যোগাযোগ স্থাপন কারী ইত্যাদি। (ফিরুজুল লোগাত)

উসিলা শব্দের তরজমা করা হয়েছে কোনো জিনিসের নিকট আগ্রহ সহকারে পৌঁছা। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী এ মত ব্যক্ত করেছেন।

মোফাস্সিরগণ উসিলা শব্দের অর্থ নৈকট্য লাভ করা, নিকটবর্তী হওয়া, নৈকট্য লাভের উপায় বা রাস্তা বা আনুগত্য বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী তাফসীরে কবীরে এর অর্থ লিখেছেন, "উসিলা সেই আনুগত্য বা ইবাদত যা তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) নিকটবর্তী করে দেয়।"

আল্লামা ইবনে কাসীর ব্যক্ত করেছেন, "ইলমে কোরআনের এই ইমামগণ উসিলা শব্দের যা কিছু বলেছেন সে বিষয় মোফাস্‌সিরগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।" তিনি উসিলা শব্দের আরও দু'টো অর্থ লিখেছেন, (১) উসিলা এমন জিনিস যার সাহায্যে মূল লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। আর (২) উসিলা জান্নাতের এক উচ্চতর মঞ্জিলের নাম। আর তা হচ্ছে রাসুল করীম (সাঃ)এর মহা উচ্চ মর্তবা। (উপরোক্ত উসিলা শুধু রাসুল (সাঃ)এর প্রতিই প্রযোজ্য),

আল্লামা আবুস ও আল্লামা জামাখশারী তাঁদের ভাষায় বলেছেন, "উসিলা সেই বস্তু যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়-আল্লাহর পর্যন্ত পৌঁছা যায়।"

অনেক মোফাস্‌সির আল্লাহ্‌র আসমায়ে হুসনার যে কেএনা নামের উসিলা বা নেক আমলের বরাত দিয়ে দোয়া করাও উসিলার মধ্যে গণ্য করেছেন। এরূপ বহু মোফাস্‌সির তাদের নিজস্ব বহু মত ব্যক্ত করেছেন। তবে মোফাস্‌সিরগণের মতের সমন্বয় করতে গেলে একথাই দাঁড়ায় যে, উসিলা সেই জিনিস যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন বা যার সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য হাসেল করা যায়। আবার আল্লামা ইবনে কাসীরের ভাষায় বলা যায়, "ইলমে কোরআনের ইমামগণ উসিলা শব্দের অর্থে যা কিছু বলেছেন সে বিষয় তাফসীরকারকদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।"

তবে সুরা মায়েদার উপরোক্ত বর্ণিত আয়াতের স্পষ্টত্ব ব্যক্ত করা হয়েছে "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তায় উসিলা অনুসরণ কর এবং কঠোর রিয়াজত সাধনা ও নফসের সাথে জিহাদ কর।

এখানে এ আয়াতের উসিলা শব্দ দ্বারা সেই বস্তুকে বুঝানো হয়েছে যার সাহায্যে খোদ আল্লাহকে পাওয়া যায়। এই আয়াত দ্বারা উসিলা শব্দের অর্থ যে কোন মোফাস্‌সির যে অর্থই করুন না কেন আল্লাহতায়ালা স্বয়ং এখানে উসিলা শব্দ দ্বারা তাঁকে পাওয়ার রাস্তা স্পষ্ঠভাবে চিহ্নিত করে বুঝিয়েছেন। অতএব আমরা 'উসিলা' শব্দের অর্থ এমন মধ্যস্থতা বা অবলম্বন বলে উল্লেখ করতে পারি যার সাহায্যে আল্লাহকে লাভ করা যায়।

কোরআন হাদিসের আলোকে ইবাদতে, প্রার্থনায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহপ্রাপ্তি পথে উসিলা বা মধ্যস্থতা অপরিহার্য একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো। তবে খোদ আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি যোগ-সাজস বা মধ্যস্থতা করতে কোন রাস্তা অনুসরণীয়, নিম্নে আমরা ধারাবাহিকভাবে যোগ করে তার একটা বর্ণনা দিয়ে দিলাম।

ফাতিহাতুল কিতাব বা উম্মুল কোরআনের আলোকে অর্থাৎ কোরআন শরীফের

প্রথম সুরায়

কোরআন শরীফে সুরা ফাতিহা ৫,৬,৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন,

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

উচ্চারণ: ইহ্দিনাছ ছিরা-তাল মুস্তাকিম, অর্থ আমাদেরকে সহজ সরল পথ দেখাও। মহান আল্লাহতায়ালা এখানে কোন সহজ সরল পথের কথা বলছেন? পরবর্তী ৬নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন,

صِرَاطَ الَّذِينَ اَنعَمتَ عَلَيهِم

উচ্চারণ: 'ছিরা ত্বাল্লাজিনা আন্ আম্তা আলাইহিম' অর্থ : সেই সমস্ত মানুষের পথে যাদেরকে আমি আল্লাহ অনুগ্রহ বা নেয়ামত দান করিয়াছি। তারাই হল-আল্লাহতায়ালার খাসবান্দা, সাদিকীন, আউলিয়ায়ে কেরামগণ। যে সমস্ত লোকদের অনুসরণ করতে নিষেধ করে মহান আল্লাহতায়ালা ৭ নং আয়াতে বলেন,

غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِم وَلاَ الضَّالِّينَ

উচ্চারণ: 'গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালা দ্বোয়াল লীন' অর্থ: সমস্ত মানুষের পথে নয়, যে সমস্ত মানুষ আমার (আল্লাহ) গজবে নিপতিত বা পথভ্রষ্ট হয়েছে। কোরআনের এই শক্ত দলিল থাকা সত্ত্বেও যারা হুজ্জুতি করে, উসিলা বা নায়েবে রাসুলকে মানতে চায় না, আমি তাদের স্পষ্ট বলতে চাই, সুরা ফাতিহাকে নেছফুল কোরআন বলা হয়, সেই সূরার দ্বারাই স্পষ্ট দলিল দিলাম।

পাঠকগণ, সুরা ফাতিহার ৫,৬,৭ নং আয়াত সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে দেখুন মহান আল্লাহতায়ালা মানুষ ধরার কথা বা উছিলা ধরার কথা বলেছেন কি না? তদুপরি তাঁর ওই সকল নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কারা? তিনি তাদেরও সঠিক পরিচয় সুরা নিসার ৬৯ নং আয়াতে আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন।

وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَاُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللهُ عَلَيهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيقًا.

ওয়া মাই ইউত্বি' ইল্লাহা ওয়ার রাসূলা ফাউলা-ইকা মা'আল্ লাযীনা আন'আমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যীনা ওয়াস্ব স্বিদ্দীক্বীনা ওয়াশ শুহাদা-ই ওয়াস্ব স্বালিহীন ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফীক্বা।

অর্থ:- আর যে মহান আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর মনোনীত নেয়ামতপ্রাপ্ত প্রিয় বান্দা তাঁরাই, যাঁদের প্রতি মহান আল্লাহতায়ালা বিশেষ অনুগ্রহ

করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন-আম্বিয়া, সিদ্দিক, শোহাদা এবং সলেহীন অলি-আউলিয়াগণ। তাঁর পাক দরবারের মকবুল বান্দাদের মধ্যে সর্বোচ্চস্তর আম্বিয়া বা নবীগণের; তৎপর সিদ্দিক এবং সলেহীনদের, আম্বিয়াগণ উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্তবা ও মর্যাদার অধিকারী, শরিয়ত এবং রূহানী কামালিয়াত যাঁদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সহজ কথায় যাঁদের আউলিয়া বা আল্লাহর প্রিয় পাত্র বলা হয়। এ ছাড়া যাঁরা মহান আল্লাহ রাসুলের আদেশে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন তাঁরা হলেন শহীদ। (আল্লাহর পরিভাষায় শহীদগণের মৃত্যু নেই বরং তাঁরা চিরঞ্জীব)। (তফসীরে আলী হাসান)।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তবে কি মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর নাজিলকৃত কিতাব আল-কোরআন এবং রসুলের (সাঃ) হাদিসকে বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্তদের রাস্তাতেই লোকদেরকে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন? মহান আল্লাহ তাঁর মহিমান্বিত কিতাবের প্রথম সুরা ফাতিহাতুল কিতাবের ৬ষ্ঠ নং আয়াতে আমাদেরকে যাদের অনুসরণ করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন উপরে ঠিক তারই তরজমা করা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলের হাদিসসমূহকে বাদ দিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে। আমাদের তথা সাধারণ লোকদের জন্য মহান আল্লাহ রাসুলের তাৎপর্য বুঝে চলা কষ্টসাধ্য বিধায় মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রেরিত খলিফা বা প্রতিনিধিদের নির্দেশিত রাস্তায় আমাদের চলার জন্য উক্ত আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। যাদের তিনি তাঁর বিশিষ্ট সেফাত সমূহের কিছু অংশ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং ওই সকল বিশিষ্ট বান্দাগণ তাঁদের সারাজীবনের ত্যাগ তিতীক্ষা, সাধনা বা শোগল আশাগালের বিনিময়ে আল্লাহর এবং রাসুলের কিতাব সমূহে বর্ণিত এবং উল্লেখিত অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সমূহ ঐশী প্রভাবে উত্তমরূপে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব এখানে সমালোচনার অবকাশ থাকে না। বান্দাদের রাস্তাতেই চলার অর্থ আল্লাহর কিতাব তথা স্বয়ং আল্লাহর রাস্তাতেই চলা এতে কোন সন্দেহ বা সমালোচনার প্রশ্ন উঠে না। এতে সহজেই প্রমাণ হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির রাস্তায় চলতে হলে, সিরাতুল মুস্তাকিমে চলতে হলে তাঁর নেয়ামতপ্রাপ্ত অলি আউলিয়াদের অনুসরণ, মহব্বত ও পায়রবী অবশ্যই করতে হবে এবং শরিয়ত ও রুহানী কামালিয়াতে পরিপূর্ণ মহামানবগণই হচ্ছেন মহান আল্লাহ প্রাপ্তির সরল পথের উসিলা স্বরূপ। এবং স্বয়ং মহান আল্লাহতায়ালা কর্তৃক এ উসিলা অবলম্বনের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ওই পুস্তকের দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে ফাতিহাতুল কিতাবের পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আল্লাহর নির্দেশের প্রতি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আসমান ও জমিনের যে দিকে তাকাও সমগ্র সৃষ্টিজগত- কূলকায়েনাতের মালিক

মহান আল্লাহতায়ালা। তিনি রক্ষাকর্তা পালনকর্তা লালনকর্তা ধ্বংস এবং নিয়ন্ত্রণকর্তা, সর্ব জায়গায় বিরাজমান। মানুষ সৃষ্টির পর হতে সৃষ্টি জগতের কোনো সাধারণ মানুষ (হুজুর সা. ব্যতীত) আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে চর্মচোখে দর্শন করেনি অথচ অনাদিকাল হতে তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তাঁর কোনো লয় নেই, ক্ষয় নেই, নেই ধ্বংস। তিনি চিরস্থায়ী হাইউল কাইয়ুম।

সেই মহান সত্বা মহান আল্লাহতায়ালা নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ফেরেস্তাদের সম্মুখে ঘোষণা করলেন-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّى جَاعِلٌ فِى الأَرْضِ خَلِيفَةً

উচ্চারণ: ওয়া ইয্ ক্বালা রাববুকা লিল মালা-ই কাতি ইন্নি জ্বা-ইলুন ফিল আরদ্বি খালীফা।

"স্মরণ কর, যখন মহান প্রতিপালক ফেরেস্তাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো।" (সুরা বাকারা ৩০ আয়াত)

মহান আল্লাহ তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধিকে (আদমকে) এত উচ্চ সম্মান দিলেন যে, তা অতুলনীয়। তিনি এ মর্মে পুনরায় ঘোষণা করলেন,

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوٓا اِلاَّ اِبلِيسَ ط

উচ্চারণ:ওয়া ইয কুলনা লিল মালা-ইকাতিস জুদূ লি-আদামা ফাছাজাদূ ইল্লা ইব্‌লীশ।

"হে ফেরেস্তাগণ ! তোমরা আদমকে সেজদা কর।"(সুরা বাকারা ৩৪ আয়াত) অর্থাৎ নূরের তৈরী ফেরেস্তাগণ কর্তৃক মাটির তৈরী আদমকে সেজদা করানো হলো। এ সমস্ত ফেরেস্তাকুলের মধ্যে ফেরেস্তা শ্রেষ্ঠ জিব্রাঈল, মিকাঈল, আজরাঈল ও ইস্রাফিলও আওতাভুক্ত ছিলেন।

হাদিসে-কুদসীতে মহান আল্লাহতায়ালা আরও ঘোষণা করেন

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لا عرف

উচ্চারণ ঃ কুনতু কানজান মুখফিয়ান ফা আহবাবতু আন্না আরাফা ফা খালাকতুল খালকা লা আরাফা। (হাদিসে কুদসী)

"আমি এক নিহিত ধনাগার ছিলাম, নিজেকে প্রকাশ বিকাশ করার জন্য আদম-হাওয়াকে আমি ভালোবেসে প্রকাশিত হলাম এবং আমি মহান আল্লাহ জানার জন্য বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করলাম।"

মহান আল্লাহতায়ালা নিজেকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বিশ্বজগত সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর সৃষ্টির রহস্যের উসিলা ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর প্রেম বা ভালোবাসা।

মহান আল্লাহতায়ালা সবসময় ক্ষমতার অধিকারী যে শুধুমাত্র কুন শব্দ দ্বারা সৃষ্টি জগত তৈরী করলেন। কোরআন শরীফের অন্যত্র

সুরা ইউনুসের ৩ আয়াতে

اِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ استَوٰى عَلَى العَرْشِ يُدَبِّرُ

الاَمَرَ ط ما مِن شَفِيعٍ اَلاَّ مِن بَعدِ اِذنِهِ ط ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فاعبُدُوهُ ط اَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

উচ্চারণ:ইন্না রাব্বাকুমুল্লা-হু ল্লাযী খালাক্বাস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্বা ফী সিত্তাতি আই য়্যামীন ছুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশি ইউদাববিরুল আমর-মা মিন শাফিয়ীন ইল্লা মিম বা'দি ইযনিহ যালিকুমুলল্লাহু রাব্বাকুম ফা'বুদুহ আফালা তাযাক্কারূন।

তিনি ঘোষণা করেন যে, ছয় দিবসে তিনি বিশ্বজগত (আসমান, জমিন, আরশ, কুরশী, লওহ কলম, বেহেশত, দোযখ প্রভৃতি) সৃষ্টি করলেন। ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর কোনো খলিফা বা প্রতিনিধি ব্যতীত নিজেই নিজেকে প্রচার ও প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে আদম (আঃ) হতে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ পয়গম্বর বা প্রতিনিধি প্রয়োজন মতো যুগে যুগে তিনি পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে জিব্রাঈল (আঃ) এর মধ্যস্থতায় (উসিলায়) ওহী মারফত কথা বার্তা, কালাম বিনিময় করতেন, আদেশ, উপদেশ দিতেন। কিন্তু তিনি সরাসরি মানুষকে উপদেশ দেয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। যেমন মুসা (আঃ) এর সঙ্গে তুর পাহাড়ে তিনি সরাসরি আলাপ করেছেন। যে আলাপ সমূহের সমষ্টি তওরাত কিতাব।

শেষ জামানায় তাঁর শ্রেষ্ঠতম বন্ধু সারওয়ারে দো'আলম হুজুর (সাঃ) এর সঙ্গে পৃথিবীতে এবং মেরাজ শরীফে 'ওহীমাতলু' ও 'ওহী গায়রি মাতলু' মারফত জিব্রাঈলের মধ্যস্থতায় এবং সরাসরি নিজে তাঁর হাবীবের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কালাম বিনিময় করেছেন।

যুগ যুগ ব্যাপী লক্ষ লক্ষ পয়গাম্বর এবং রাসুল মারফত তিনি যে অসংখ্য কালাম, আদেশ, উপদেশ, দিক নির্দেশনা ও নিষেধ প্রদান করেছেন তার সমস্তই মানুষ এবং জ্বীন জাতের জন্য মুক্তি ও হেদায়েতের উদ্দেশ্যেই করেছেন। কিন্ত কেন? তাঁর তো ক্ষমতার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তিনি অসীম, অনন্ত বিচার দিনের হাকিম ও স্বামী। ইচ্ছা করলে প্রকাশ্যে বা গোপনে, স্বশরীরে বা অদৃশ্যভাবে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কওমে ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তিনি স্বয়ং তাঁকে প্রকাশ ও প্রচার করতে পারতেন। তাঁর অসীম মহিমাও ব্যক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি

তা করেননি। আল্লাহর বিশ্বাসী কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, তিনি উপরোক্ত ক্ষমতা সমূহের অধিকারী নন। তিনি সর্বশক্তির অধিকারী একথা চরম এবং পরম সত্য। বস্তুত: তাঁর অভিপ্রায় তিনি সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই খলিফা বা প্রতিনিধির মাধ্যমে বা উসিলায় তিনি তাঁকে, তাঁর মহান ও অসীম অস্তিত্ব পৃথিবীর বুকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মহান আল্লাহতায়ালা ভালোবেসে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। হাদিসে কুদ্সীতে আছেঃ- "আল্ইনসানো সিররি ওয়া আনা সিররুহু" অর্থাৎ মানবজাতি আমার গুপ্তভেদ এবং আমি মানুষের গুপ্তভেদ।

মহান আল্লাহতায়ালা ঘোষিত এ খেলাফতের ব্যাপারে যেখানে খোদ মালিক (মহান আল্লাহ) জড় চক্ষুর অন্তরালে সেখানেই সে মহান সত্তার খলিফা বা প্রতিনিধির প্রয়োজন; যেহেতু আল্লাহর মহিমান্বিত খলিফাগণের মধ্যস্থতায় বা উসিলায় আল্লাহর বাণী মানুষ এবং জ্বীন জাতির কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আল্লাহর সঙ্গে তাঁর সেই খাছ প্রতিনিধিগণের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। তদুপরি জিব্রাঈলের মধ্যস্থতায় আল্লাহর সেই মহান খলিফাদের যোগাযোগ হয়ে আসছে। হুজুর (সাঃ) এর পর আর কোন নবী আসবেনা। তবে নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেন, আল-উলামা-উ ওরাসাতুল আম্বিয়া।
হক্কানী কামেল মোর্শেদগণ আমার প্রতিনিধি। হুজুর (সাঃ) অন্যত্র ফরমান, "আমার উম্মতগণের মধ্যে হক্কানী কামেল মোর্শেদগণ বানী ইস্রাইলের নবীগণের সমতুল্য। ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াগণ শরীয়ত ও মারেফতের এলেম ব্যতিরেকে হক্কানী কামেল মোর্শেদ হতে পারবেন না।

মহান আল্লাহতায়ালার রাসুল (সাঃ) এর বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় মহান আল্লাহ ঘোষিত খেলাফতি বা প্রতিনিধিত্ব কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এখন প্রশ্ন, সত্যিকারের আলেম কারা? সব আলেমই তো মহান আল্লাহতায়ালা এবং নবীর প্রতিনিধি হতে পারেন না। কেননা শয়তান অপেক্ষা বড় আলেম সাধারণ আলেমদের মধ্যে কেউ নেই। মহান আল্লাহতায়ালার রাসুল (সাঃ) মনোনীত আলেমের ব্যাপারে হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ), হযরত গাউসুল আযম (রঃ) ও পৃথিবীর প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছগণ রায় দিয়েছেন, যে সমস্ত আলেম উম্মি নবীর ইল্মে রাসেখ বা নবীর ওয়ারেছ তথা আল্লাহর খলিফা। এল্হাম, কাশ্ফ ও রুইয়ায়ে সাদেকা মারফত মহান আল্লাহতায়ালা এবং নবী (সাঃ) এর সঙ্গে প্রয়োজনমত তাঁদের আত্মিক যোগাযোগ হয়ে থাকে এবং সেভাবে তাঁরা পথভ্রষ্ট মানুষকে হেদায়েত ও পরিচালিত করেন।

তাহলে দেখা গেল মহান আল্লাহতায়ালা সর্ব ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মহান সত্ত্বা অসীম ক্ষমতা, অসীম মমতা, দয়া এবং ক্ষমার আদর্শ ও উৎস প্রভৃতি সিফাত সমূহ (গুণরাজী) তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যম বা উসিলায় প্রকাশ করতে অধিক আগ্রহী এবং সে প্রতিনিধিগণ হলেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। মহান আল্লাহতায়ালা স্বয়ং স্রষ্টা হয়েও তাঁর প্রকাশ ও বিকাশের উদ্দেশ্যে বেছে নিলেন মাধ্যম বা উসিলা।

ওহে আল্লাহর সৃষ্টির সেরা মানুষ। তোমরা জেনে নাও, উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে আমরা কি বেছে নেব? রাসুল (সাঃ) ঘোষিত নজদের শয়তানের মতবাদ নাকি আল্লাহর মনোনীত, "সিরাতুল মুস্তাকিম?

নজদের শয়তান কে বা কারা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য বহু হাদিসের উদ্ধৃতি রয়ে গেছে। তার মধ্য হতে আমরা মাত্র একটি হাদিসের উদ্ধৃতি তুলে দিলাম যাতে করে সাধারণ লোকের মধ্যে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে না পারে।

সহীহ বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড ১০৫১ পৃঃ এবং মেশকাত শরীফের ৫৮২ পৃষ্ঠায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত হয়েছে, -

عن ابن عمر قال قال انبى صلي الله عليه وسلم الهم باركنا فى شامنا الهم باركنا
فى يامننا قلوا يارسول الله وفى نجد ناء قال الهم باركلنا فى شامنا الهم بارك لنا فى
يامننا وفى نجدنا فتنة قال فى الثالثة هناك الزلزل والفتنة وبها يطاع قرن الشيطان

হাদীছ: হাদ্দাসনা আযহারু ইবনে সাঈদ আন ইবনে উন আন নাফেয়ে আন ইবনে ওমর ক্বালা যাকারান নাবিয়্যে (সাঃ) কালা আল্লাহুম্মা বারেকলানা ফিসামানা আল্লাহুম্মা বারেকলানা ফি ইয়ামিনেনা ক্বালু ইয়া রাসুলাল্লাহ ওয়াফি নাজদেনা ক্বালা আলাহুম্মা বারেক-লানা ফি সামেনা আল্লাহুম্মা বারেকলানা ফি ইয়ামিনেনা ওয়াফি নাজদিনা। ফিতনাতিন কালা ফিল ছালাছাতিন হুনাকা ঝাল ঝালা ওয়া ফিতনাতি ওয়াবিহা ইয়াতলাউ কারনিস শাইতান। ৬৮১৫ নং হাদিছ মূল বুখারী থেকে নেওয়া ২য় খন্ড ১০৫১ পৃঃ মেশকাত ৫৮২ পৃঃ

"একদিন রাসুলে করিম (সাঃ) অত্যন্ত মনোযোগ এবং আকুল চিত্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন- হে খোদা! তুমি দয়া করে শাম ও ইয়েমেন দেশে বরকত নাজিল কর। উপস্থিত জনতার কিছু নজদবাসি আরজ করল, হুজুর আমাদের নজদের জন্য দোয়া করুন। হুজুর (সঃ) পুনরায় শাম ও ইয়েমেনের জন্যই বরকতের দোয়া করলেন। উপস্থিত নজদবাসীদের কিছু লোক পুনরায় আরজ করল- হুজুর আমাদের নজদের জন্যও দোয়া করুন। তৃতীয়বার অনুরোধের পর

হুজুর (সাঃ) নজদের জন্য দোয়া করতে অস্বীকার করে বললেন- আমি এদেশের জন্য কি করে দোয়া করবো? কারণ সেখানে তো ইসলামের মধ্যে ফেৎনা সৃষ্টি হবে এবং তথায় শিংওয়ালা শয়তানের দলের উৎপত্তি হবে।"

আজ পর্যন্ত নজদে ওয়াহাব নজদীপন্থী ছাড়া ইসলামের মধ্যে ফেৎনা সৃষ্টিকারী অন্য কেউ জন্মেনি। অতএব নিঃসন্দেহে ওয়াহাব নজদী রসুলের ভবিষ্যৎবানী অনুযায়ী শিংওয়ালা শয়তানের দলপতি। এছাড়া ওয়াহাব নজদী বনুতামীম গোত্র এবং খারেজী দলের বংশোদ্ভূত।

ওয়াহাবী তথা খারেজী মতবাদের মধ্যে আরো একটি উল্লেখযোগ্য নীতির উল্লেখ রয়েছে যে, নামাজ বা অন্য ইবাদতের মধ্যে নবী, অলি, ফেরেশতা প্রভৃতির মধ্যস্থতা উল্লেখ করা চলবে না, - চলবে না কোন ইবাদত ও মোনাজাতে আল্লাহর কাছে কোন উসিলা বা মধ্যস্থতার উল্লেখ। মোনাজাত ও ইবাদতে কোন মধ্যস্থতা বা উসিলা গ্রহণ করা তাদের মতে শির্ক।

Calcutta Review নামাংকিত Calcutta University কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের C. CI. ও C. CII. সংখ্যায় wahab is in India শীর্ষক তিনটি বৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ লেখক জনৈক খ্যাতনামা ইংরেজ। তিনি Anonymous ছদ্ম নামের অন্তরালে ওই প্রবন্ধগুলো প্রকাশ করেন। ওয়াহাবী কার্যকলাপ ও মতবাদ ধর্মপ্রাণ মুসলিম জাহানে ব্যাপক ক্ষোভ, ত্রাস ও সমবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপরোক্ত মতবাদ ছাড়াও বহুসংখ্যক ওয়াহাবী মতবাদ তার প্রণীত বেশ কয়েকটি পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "কিতাবুদ-তৌহিদ" নামক পুস্তকে হস্তলিখিত ভাবে নজদী কর্তৃক আক্রান্ত ও দখলকৃত স্থানে প্রচার করা হয় এবং তদীয় মতবাদ যারা অমান্য করে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। অধিকন্ত তার মতাদর্শ অমান্যকারী যেই হোক সেই কাফের বলে আখ্যায়িত ও নির্যাতিত হয়েছে। এ সমস্ত মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মুসলিম জাহানের ওলামায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে বিশ্ব বিখ্যাত ফতুহাতে ইসলামিয়া গ্রন্থের খোলাছাতুল কালাম ফি ওমরায়ে বালাদিল্লাহিল হারাম (এর ১৭০ পৃষ্ঠা হতে ২০৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্রষ্টব্য) ফতোয়া গ্রন্থে ওয়াহাব নজদীর মতবাদ সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী ভ্রান্ত ও হিংসাত্মক বর্ণনা করে খারেজী ওয়াহাব নজদীকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হয়। নজদী ও তার অনুসারীদের ইসলামদ্রোহী কার্যকলাপ ছাইফুল জবার এবং তাওয়ারীখে মুহম্মদীয় আলা আর গামাতে নজদীয়াত তারিখ বা ইতিহাসে উল্লেখ আছে। এছাড়া বিশ্ববিখ্যাত ফেকাহবিদ আল্লামা শামী 'রুদ্দোল মুখতার এর ৩য় খণ্ডের ৩০৯ পৃষ্ঠার 'ভারে বোগাতে' এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া The Indian Mussalmans by

W.W.Hunter ও ওয়াহাবী আন্দোলন By Justice Moudud প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে উল্লেখ আছে। সাইখুল হাদিস ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর রচিত সাইফুল মাযাহেব গ্রন্থে ওয়াহাবী মতবাদ সমূহের জঘন্য প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহের বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইসলামী বিশ্বকোষ (Encyclopedia) এর উদ্ধৃতি রয়েছে।

বিশ্ব মুসলিমের অকুণ্ঠ ক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে অধুনা কিছু সংখ্যক ওয়াহাব নজদী মতাবলম্বী রাষ্ট্র তাদের বিপুল আর্থিক আনুকুল্যে সংশোধিত আকারে নজদীর হস্তলিপি সমূহের পুনঃ মুদ্রণে ও বিনামূল্যে ব্যাপকহারে বিতরণের ফলশ্রুতিতে অসংখ্য মুসলমান রাসুলের প্রবর্তিত ইসলামের বহু সংখ্যক মৌলিক আকিদা হতে বিচ্যুত হতে চলেছেন। নজদীপন্থী লিখিত পুস্তকে তাদের কার্যকলাপের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, ইসলামের তীর্থ মক্কা ও মদিনার পবিত্রতম মসজিদদ্বয় মসজিদুল হারাম, মসজীদে নববীতে হুজুর (সাঃ) এর মক্কা বিজয়ের পর হতেই হুজুর (সাঃ) এর আদেশে জামাতে এবং কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের প্রথানুযায়ী নামাজ আদায় করে আসছেন। এসব নামাজের মধ্যে ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্, সুন্নতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ্, নফল প্রভৃতি নামাজ আদায় করে আসছেন। এতদ্পরি অনেকে শেষরাতে রহমতের সময় তাহাজ্জুদ এবং অনেকে নফল নামাজ এবং আল্লাহর জিকর আজকার প্রভৃতি ১০০ হিজরী পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে পালন করে এসেছেন। তদুপরি রাসুলের উপর দরূদ শরীফ পাঠ, রাসুলের জীবন আলোচনা বা মিলাদ মাহফিল, নাতে রাসুল, হালকায়ে জিকির, খুৎবা বা ভাষণে মহান আল্লাহ এবং রাসুল (সাঃ) এর মহব্বতে গোপনে এবং প্রকাশ্যে চোখের পানি ফেলা প্রভৃতির বহুল প্রচলন ছিল। এটাই ছিরাতুল মুস্তাকিম, এটাই রাসুল এবং সাহাবাগণের প্রকৃত সুন্নত। এটাই প্রকৃত ইসলাম। কিন্তু ১০০ হিজরীর শুরু হতেই তথাকথিত ওয়াহাব নজদী মহান আল্লাহ রাসুলের নির্দেশিত উপরোক্ত নীতি সমূহের অনেক কিছু রদবদল করে তার নিজস্ব মনগড়া বহু ইসলামবিরোধী আকিদার প্রচলন করে। যার বহু দলিল, প্রমাণ ও ইতিহাস মুসলিম জাহান ও আমাদের কাছে আছে। বর্তমান সরকার মহান আল্লাহ রাসুলের নীতি সমূহের পরিবর্তে তার নিজস্ব মতবাদ মক্কা মদিনাতে এখন পর্যন্ত চালু রেখেছে। যেমন মক্কা শরীফের ওয়াহাবীপন্থী স্থায়ী বাসিন্দাগণ ফরজ নামাজের পর কোন মোনাজাত করা, রাসুলের সুন্নত এবং নফল নামাজ সমূহ আদায় করা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। হুজুর (সাঃ) এর নাম উচ্চারণের পরে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' উচ্চারণ করার প্রয়োজন বোধ করেন না। অথচ যে নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সালাত ও

সালাম পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজেব।

তিরমিজি ও মিশকাত শরীফের রেওয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

রগীমা আনফা-রজুলিন যুকিরত্ব ইনদাহু ফালাম ইউসাল্লি আলাইয়া (রওয়াহু তিরমীজি ও মিশকাত)

অর্থ : সেই ব্যক্তি অপমানিত ও ধ্বংস হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হল, কিন্তু সালাতুস সালাম পাঠ করল না (তিরমীজি ও মিশকাত শরীফ)

আল-বাখিলু মান যুকিরত্ব ইনদাহ ফালাম ইউসাল্লি আলাইয়া (রওয়াহু মিশকাত)।

অর্থঃ সেই ব্যক্তি সবচেয়ে অধিক কৃপণ, যার সম্মুখে আমার নাম উচ্চারণ করা হল, কিন্তু সে দরূদ ও সালাম পাঠ করল না (মিশকাত শরীফ)।

হুজুরের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সালাত, সালাম পাঠ না করা শাস্তি যোগ্য বলে সহীহ হাদিস সমূহে উল্লেখ আছে। এছাড়া মক্কা মদিনার পবিত্র মসজিদদ্বয়ে, মক্কা মদিনায় প্রকাশ্যভাবে হুজুর (সাঃ) এর জীবনী আলোচনা তথা মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করার রেওয়াজ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। মদিনা শরীফের পবিত্র কবরস্থান "জান্নাতুল বাকী" যেখানে হুজুর (সাঃ) এর প্রাণপ্রিয় তনয়া খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা জহুরা (রাঃআঃ)-র রওজা, হযরত ইমাম হাসান (রাঃ), আহলে বায়াতে রাসুলদের অনেকের এবং আজুয়াজে মুতাহেরাত এবং বহু খাছ সাহাবীর মাজার সমূহ বিদ্যমান রয়েছে, যে জান্নাতুল বাকী হুজুর (সাঃ) প্রায় রাত্রেই জিয়ারত করতেন এবং কবরের দিকে মুখ করে মোনাজাত করতেন, ওই সমস্ত পবিত্র মাজার শরীফ সমূহ এবং জান্নাতুল বাকী ওয়াহাবী সরকার চরম ধৃষ্টতা এবং বেয়াদবী করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, স্বয়ং হুজুর (সাঃ), সিদ্দিকে আকবর এবং ফারুকে আযম যাঁদের রওজা মসজিদে নববীর ভিতরে অবস্থিত, এ সমস্ত পূণ্যময় স্মৃতি সমূহ তথাকথিত হঠকারী ওয়াহাবীপন্থীগণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা নিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর গজবে ওই সমস্ত বিপথগামীদের চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই রওজা শরীফ যার মর্যাদা বায়তুলল্লাহ্ হতে শ্রেষ্ঠ, জিয়ারত করা, ফাতেহা পাঠ করা এবং মাজারের দিকে মুখ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা, ওয়াহাবী সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, রওজা পাকের দিকে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ এবং দোয়া করতে গেলে ওয়াহাবী সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পুলিশের আঘাত সহ্য করতে হয়। হজের মৌসুম এবং ওমরাকারীদের মধ্যে উপস্থিত বহু আশেকে রাসুল এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সুতরাং আল্লাহর রাসুলের নীতি সমূহের পরিবর্তে বর্তমানে ওয়াহাব নজদীর প্রবর্তিত নীতি সমূহ মক্কা মদিনাতে চালু আছে এবং এটা বাস্তব সত্য। বিশ্বের মুসলমান জেনে রাখুন, নামাজ বা

ইবাদতে নবী, আউলিয়া, ফেরেশতাকুল প্রভৃতির নাম উচ্চরণ না করলে নামাজ, ইবাদত বা কোরআন তেলাওয়াত কি করে সমাধা হবে তা আমাদের বোধগম্য নয়, যেহেতু গোটা কোরআন শরীফ আল্লাহর আদেশ, উপদেশ, নিষেধ এবং নবী অলিদের জীবন কাহিনীতে ভরপুর। আর আমরা নামাজের প্রতি রাকাতেই কোরআনের কিছু অংশ রাসূলে করিম (সাঃ), আদম (আঃ), নুহ (আঃ), শিষ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), ইসমাইল ও ইছাহাক (আঃ), ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ), শোয়ায়েব (আঃ), ইদ্রিস (আঃ), ইউনুছ (আঃ), জাকারিয়া (আঃ), দাউদ (আঃ), সোলাইমান এবং মুসা ও ঈসা (আঃ) প্রভৃতি নাম উল্লেখ করে থাকি। এতদপরি ইয়া আইয়ুহান্নাবিউ, ইয়া আউয়ুহাল মোজাম্মেলু, ইয়া আইয়ুহাল মোদাচ্ছেরু, হুজুরকে এ সমস্ত নামে ডেকে থাকি। এখন বিশেষ গোষ্ঠির মতবাদ মেনে চলতে হলে এ সমস্ত নবী-রসুলদের নাম সমূহ কোরআন হতে বাদ দিতে হয়। তদুপরি এ গোষ্ঠির মতানুসারে যেহেতু আমাদের হুজুর (সাঃ) মরে গিয়েছেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে সেহেতু মৃত নবী রাসুল বা ব্যক্তির নাম নামাজ, দরুদ সালাম ও স্তুতি বাক্যে ব্যক্ত করা বিদ্‌আত শির্‌ক ইত্যাদি। যেহেতু মহান আল্লাহতায়ালা কর্তৃক সংযোজিত মৃত হুজুর (সাঃ) এর নামের পূবে হে নবী, ওহে কামলি ওয়ালা, ওহে চাদর আচ্ছাদিত ব্যক্তি প্রভৃতি উচ্চারণ করাও শিরকের পর্যায়ে পড়ে যায়; সে ক্ষেত্রে কোরআন শরীফের বহু আয়াত সমূহ উক্ত মতাবলম্বির মতানুসারে মনসুখ বা বাতিল করে দিতে হয়। (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক), মহান আল্লাহতায়ালা শয়তানের দলের ওছওয়াছা হতে বিশ্বের ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে হেফাজত করুণ।

মহান আল্লাহতায়ালা সৃষ্টিজগত পরিচালনার জন্য ফেরেশতাদের দায়িত্বভার দিলেন

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিখুঁত পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য মহান আল্লাহতায়ালা জ্বীন ছাড়াও অসংখ্য ফেরেশতাকে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত করেছেন। যেমন জিব্রাঈল (আঃ) অসংখ্য নবী রসুলের প্রতি ওহী বাহক বা আল্লাহর তরফের সংবাদ আদান প্রদানের মাধ্যমে বা উসিলা স্বরূপ নিয়োজিত আছেন। মিকাঈল (আঃ) আল্লাহর তরফ হতে সমগ্র জীব জগতের রুজি রিজিক বণ্টনের মাধ্যম বা উসিলা স্বরূপ নিয়োজিত আছেন। আযরাঈল (আঃ) আল্লাহর আদেশে এক নিমিষে কোটি কোটি জীবের প্রাণ সংহারের উসিলা বা মাধ্যম স্বরুপ নিয়োজিত আছেন। ইস্রাফীল (আঃ) শিঙ্গা হাতে সমগ্র সৃষ্টিজগত ক্ষণিকের মধ্যে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর হুকুমের প্রতিক্ষায় রয়েছেন এবং তিনি একাজের জন্য মাধ্যম বা উসিলা। এ ছাড়া মুনকার নাকির আল্লাহর আদেশে মৃত কবরবাসীর

সওয়াল জবাবের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন এবং তারাই এ কাজের মাধ্যম বা উসিলা। কেরামান কাতেবিন বিশ্বের সমগ্র মানব এবং জ্বীন জাতির ভালমন্দ আমলনামার হিসাব নিকাশ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে আল্লাহর সৃষ্টি জগত পরিচালনায় মহান আল্লাহতায়ালার শাসনতন্ত্রের অমোঘ বিধান। কারো সাধ্য নেই তা অস্বীকার করে। অথচ ইচ্ছা করলে সমস্ত মাধ্যম ব্যতীতই খোদ্ মহান আল্লাহ্ এসব করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

মহান আল্লাহতায়ালাকে চিনবার এবং জানবার জন্য তিনি নবী এবং রাসুলদের উপর যুগে যুগে আসমানী কিতাব এবং সহীফা সমূহ নাযিল করেছেন। প্রামাণ্য গ্রন্থ মানব হতে ১০০ খানা আসমানী কিতাব এবং সহীফার উল্লেখ পেয়ে থাকি। তন্মধ্যে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল (বাইবেল) ও কোরআন শরীফ প্রধান গ্রন্থ। মহান আল্লাহতায়ালা জ্বীন ও ইন্সানের প্রতি তাঁর বাণী সমূহ তাঁর সম্মানিত প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এ সমস্ত কিতাব সমূহ এবং এর বাণী সমূহ মহান আল্লাহকে চিনবার ও জানবার জন্য আমাদের উসিলা নয় কি?

মহান আল্লাহতায়ালা আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, মর্ত এবং সৃষ্টি জগতের সমস্ত স্থানে বিরাজমান ও পৃথিবীতে তিনি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব, আধঃ প্রভৃতি দশদিকেই বিরাজমান। একথা জেনেও আমরা বায়তুল্লাহর দিকে নামাজ পড়ি কেন? মহান আল্লাহ তো সবখানেই আছেন। তবে আমরা নামাজ তো সবদিকেই পড়তে পারি কিন্তু এরূপ না করে আমরা বায়তুল্লাহকে কেবলা করি কেন? বায়তুল্লাহ্ একটা পাথরের ঘর ব্যতীত তো আর কিছুই নয়। কেউ যদি এই নিয়ত করে নামাজ পড়ে যে আমরা আল্লাহর ঘরকে সেজদা করছি তবে তার চেয়ে শিরক তো আর কিছুই হতে পারে না। কেননা আমরা জায়নামাজের দোয়া হতে শুরু করে নামাজের নিয়ত এবং মহান আল্লাহ রাসুলের বাণী অনুযায়ী মনে প্রাণে একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর ইবাদত করছি এবং তাঁকে সেজ্দা করছি, এ বলে আল্লাহর কাছে ওয়াদা করছি। সে ক্ষেত্রে আমরা মহান আল্লাহকে ভুলে গিয়ে আমাদের খেয়ালের দৃষ্টি দ্বারা অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির ধ্যান করে মহান আল্লাহকে সেজ্দা করি, তবে কি সেটা গায়রুল্লাহ সেজ্দা হয় না? বায়তুল্লাহ্কে কেবলা করে সেজ্দা করা আল্লাহর অমোঘ বিধান। আল্লাহর হুকুম এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমরা মহান আল্লাহতায়ালার এ নির্দেশ মেনে থাকি। তাই বলে মহান আল্লাহকে সেজদা না করে আল্লাহর কাবা ঘরকে সেজদা করা কখনই আল্লাহর অভিপ্রেত নহে।

মহান আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন:

لَيْسَ الْبِرَّ ان تُوَلُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن اٰمَنَ بِاللّٰهِ.

সুরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৭৭
উচ্চারণ:"লাইসাল বির্‌রা আনতুওয়াললু উজুহাকুম ক্বিব্‌লাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি ওয়া লাকিন্নাল বির্‌রা মান আমানা বিল্লাহি।" তোমরা (নামাজে) তোমাদের মুখমণ্ডলকে পূর্ব পশ্চিম (বা যে দিকেই) করনা কেন তাতে তোমাদের কোনও পুণ্য হয় না বরং প্রকৃত পুণ্যের অধিকারী তারাই যারা প্রকৃত মহান আল্লাহ (মনেপ্রাণে) বিশ্বাসী। বায়তুল্লাহকে কেবলা করার আল্লাহর হুকুমের মর্ম হলো এই যে, মহান আল্লাহকে উপাসনা করার উসিলা বা মাধ্যম হলো বায়তুল্লাহ।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক আল্লাহর হুকুম ও মহব্বতে তদীয় প্রাণাধিক পুত্র ইসমাইল (আঃ)-কে কোরবানী করার প্রয়াস বা চেষ্টা সমগ্র সামর্থবান মুসলমানদের প্রতি কোরবানী করার উসিলা স্বরূপ। এই কোরবানী করা বিত্তশালী মুসলমানদের প্রতি ওয়াজেব করা হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ নিয়ম চালু থাকবে।

এইরূপ হজ্জের মৌসুমে কাবা ঘর তোয়াফ করা, সাঈ করা বা সাফা মারোয়া দৌড়ান, মিনায় কোরবানী, মুজদালেফায় অবস্থান করা, শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর স্ত্রী, ইসমাইল (আঃ) এর মা হাজেরা প্রভৃতির কৃতকর্ম সমূহের স্মৃতি রক্ষার উসিলা স্বরূপ হজ্জ যাত্রীদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ উসিলায় সমগ্র মুসলিম জগতে ঈদুল আযহার নিয়ম প্রচলিত হয়েছে। এ উসিলাও প্রবর্তিত হয়েছে মহান আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আদেশে। মাথা নিচু করে কা'বা ঘরের কালো পাথরকে চুম্বন করাও মহান আল্লাহ রসুলের নির্দেশ। ঈদুল আযহার দু'রাকাত ওয়াজীব নামাজও ইব্রাহীম (আঃ) এর কৃতকর্মের উসিলা।

নবী (সাঃ) উম্মতগণের নাজাতের উসিলা

মহান আল্লাহর ভালবাসা এবং তাঁর ক্ষমা লাভ করার শর্ত হিসেবে মহান আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন, সুরা আল ইমরান ৪ রুকু ৩১ আয়াত-

قُلْ اِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحبِبكُمُ اللهُ وَيَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُم وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

উচ্চারণ: কুল ইন কুনতুম তুহিববুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী ইয়ুহবিবকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগ ফির লাকুম যুনূবাকুম ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহীম।

অর্থ:- প্রিয় হাবীব (সা:) বলুন যদি তোমরা মহান আল্লাহতায়ালাকে পাইতে চাও, তাহলে আমি রাসূল (সা:) কে ভালোবাস। মহান আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের গুনাহ্। মহান আল্লাহতায়ালা ক্ষমাকারী অতি দয়ালু (সুরা আল-ইমরান আয়াত নং ৩১)

"তোমরা যদি আমি মহান আল্লাহকে পাইতে চাও ভালবাসতে চাও তবে রাসুলের এত্তেবা (মহব্বত) কর। তবেই মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।"

মহান আল্লাহতায়ালা কোরআনে আরো ঘোষণা করেন, সুরা নিসা ৫৯ নং আয়াতে-

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اطِيعُوا الله وَاطِيعُوا الرَّسُولَ واوْلِى الأَمرِ مِنكُم.

উচ্চারণ: ইয়া আউয়্যুহাল্লাযিনা আমানু আত্বীউল্লাহা ওয়া আতীউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিন কুম।

"হে ইমানদারগণ আমি আল্লাহর আদেশ মান্য কর, আমার এত্তেবা কর, দাসত্ব কর, রাসুলের আদেশ মান্য কর এত্তেবা কর গোলামী কর দাসত্ব কর। তোমার জামানায় বা কওমে অলি মোর্শেদ বা ছাহেবে হুকুমের আদেশ মান্যকর বা এত্তেবা কর।

এ দু'টো আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসুল এবং উলিল আমরের অনুসরণ করার সুস্পষ্ট হুকুম করেছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহতায়ালার মহব্বত, তাঁর ক্ষমা লাভ করা এবং জাহান্নাম হতে নাজাত প্রাপ্তির উসিলা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। রাসুলের পূর্বেকার সমস্ত ধর্মের মতবাদ কোরআন নাযিল হওয়ার পর এবং আমাদের রাসুলের আগমনের পর মনসুখ বা বাতিল হয়ে গেছে। এখন যদি কোন ব্যক্তি বা কওম ইসলাম কবুল করতে চায় তবে তাওহীদের শ্বাশতবাণী, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ" মনে প্রাণে পাঠ করতেই হবে। নইলে কখনো সে ইসলামের জামাতভুক্ত হবে না, অথচ

হুজুর (সাঃ) বিঘোষিত সমস্ত বিপথগামী ও তাদের অনুসারীদের মতবাদ এই যে, সেই রাসুল মরে গিয়েছেন। ইবাদতে মোনাজাতে তাঁর উসিলা গ্রহণ করা শিরক। মহান আল্লাহতায়ালার অভিপ্রেত ইসলামের হালাল দীক্ষিত হতে হলে রসুলের প্রতি কালেমা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য এবং একমাত্র উসিলা।

উপরোক্ত হাদিস কোরআনের সূত্রের বর্ণনা ধারায় মহান আল্লাহ এবং সৃষ্টির মধ্যে উসিলা বা মধ্যস্থতা অস্বীকার করার অর্থই কুফুরী।

সুরা আন্‌ফালের ৩৩ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم وَانتَ فِيهِم وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُم وَهُم يَستَغفِرُونَ.

উচ্চারণ: "ওয়ামা কানাল্লাহু লিইউ আজ্জেবাহুম ওয়া আনতাফিহিম ওয়ামা কানাল্লাহু মুআজ্জেবাহুম ওয়াহুম ইয়াজ তাগফেরুন।" অর্থাৎ মহান আল্লাহতায়ালা হুজুর (সাঃ) এর শানে এরশাদ করেন, "মহান আল্লাহ কখনোই তাদের উপর আজাব গজব নাযিল করবেন না। যতক্ষণ আপনি রাসুল (সাঃ) তাদের মাঝে অবস্থান করবেন।" এছাড়া তারা (মোমেন এবং কাফেরগণ) যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে মহান আল্লাহ কখনো তাদের উপর আজাব দেবেন না। এ আয়াত শরীফ দ্বারা হুজুর (সাঃ) এর উপস্থিতিতে সে অঞ্চলের লোকদের জন্য হেফাজতের ওয়াদা মহান আল্লাহতায়ালা করেছেন। অর্থাৎ কি হায়াতে কি জিন্দেগীতে। হুজুর (সাঃ) দারুল বাকায় তশরীফ নেয়ার পর তাঁর রওজা শরীফ সংলগ্ন এলাকার লোক সমূহ কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর বড় ধরনের আজাব গজব হতে রক্ষা পাওয়ার উসিলা স্বরূপ মহান আল্লাহতায়ালা কর্তৃক সাব্যস্ত হয়েছে।

তাফসীরে মাআরেফুল কোরআনের ৪র্থ খণ্ডে সুরা আনফালের উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

"মহান আল্লাহ বলেন মোহাম্মদ (সাঃ) মক্কায় থাকার অবস্থায় মক্কার সংলগ্ন লোকদের উপর বড় ধরনের আজাব গজব নাযিল করবেন না। কারণ সমস্ত নবী রাসুলগণের ব্যাপারেই আল্লাহর নীতি এই যে, তাঁরা যে জনপদে থাকেন তাতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আজাব নাযিল করবেন না, যতক্ষণ না স্বীয় পয়গম্বরগণকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। যেমন হযরত হুদ (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ) ও হযরত লুত (আঃ) এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যতক্ষণ তাঁরা নিজেদের জনপদে অবস্থান করছিলেন, ততদিন সে অঞ্চলে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আজাব আসেনি। কিন্তু যখন তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে গেছেন তখনই সেখানে আল্লাহর আজাব নেমে এসেছে। বিশেষ করে সাইয়্যেদেল আম্বিয়া হুজুর (সাঃ) যাঁকে

রাহমাতাল্লিল আলামিন পদে অভিহিত করা হয়েছে, তাঁর কোনও জনপদে অবস্থান করা অবস্থায় সেখানকার অধিবাসীদের উপর আজাব আসা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী।

(তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪র্থ খণ্ড ২৭৫ পৃঃ)

আর মহানবী (সাঃ) এর আত্মিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থান কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। কারণ তাঁর রেসালাত কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত। এছাড়া মহানবী (সাঃ) এখনও জীবিত রয়েছেন (হায়াতুন্নবী), যদিও এই জীবনের প্রকৃতি পূর্ববর্তী জীবন থেকে ভিন্নতর।

সার কথা, হুজুর (সাঃ) এর স্বীয় রওজায় জীবিত থাকা এবং তাঁর রেসালাত কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকাটাই এর প্রমাণ যে কেয়ামত পর্যন্ত তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করছেন। আর সে কারণেই তাঁর উম্মত কেয়ামত পর্যন্ত ব্যাপক আজাব থেকে নিরাপদ থাকবে।

(তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪র্থ খণ্ড ২৭৮ পৃঃ)

উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমূহে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় হুজুর (সাঃ) এর উপস্থিতি কি হায়াতে কি কবরে সর্বাবস্থায় তাঁর এলাকাবাসী এবং তাঁর আশেকগণ আল্লাহর গজব থেকে উসিলা স্বরূপ প্রমাণিত হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা জযবুল কূলূব কিতাবের ১৮৮ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত হয়েছে।

তার অবিকল বাংলা তরজমা নিম্নে দেয়া হলো।

হুজুর (সাঃ) এর ফজিলত সম্বন্ধে হাদিস শরীফে উক্ত আছে,- "আমি ব্যতীত আর এমন কোন নবী নেই যাঁর মৃত্যুর তিনদিন পরে কবর হতে উঠিয়ে নেয়া হয়নি। আমি আমার মহান প্রভু মহিয়ান আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করেছি যে আমি কেয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতগণের মধ্যেই থাকবো। এতে তারা অর্থাৎ লোক সকল, 'ওয়ামা কানাল্লাহু লে ইউ আজ্জেবাহুম ওয়া আন্‌তা ফিহিম' এ আয়াত শরীফের ফলশ্রুতিতে বালামছিবত ও আল্লাহর আজাব গজব হতে বেঁচে থাকবে।"

(হাকীকাতুল আসীলা)

সুরা নিসার ৬৪ আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

وَلَو اَنَّهُم اِذ ظَّلَمُوا انفُسَهُم جَاءُوكَ فَاستَغفَرُوا الله واستَغفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّابًا رَّحِيمًا.

উচ্চারণ: ওয়া লাও আন্নাহুম ইযযালামু আনফুসাহুম জ্বাউকা ফাসতাগফারুল্লাহা ওয়াস তাগফারা লাহুমুর রাসুলা লাও ওয়াজাদাল্লাহা তাওয়াবার রাহীম।

হে রাসূল (সাঃ), এই সমস্ত লোকের নিজের নফসের উপরে জুলুম করে নিজেকে

ধ্বংস করে যদি আপনার দরবারে এসে হাজির হয়ে যায়, হে রাসূল (সঃ) আপনি যদি এই সমস্ত লোকদের ব্যাপারে সুপারিশ করেন আমি মহান আল্লাহকে তওবা ও ক্ষমাকারী হিসাবে পাবে।

উক্ত আয়াত শরীফে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে, কোন ব্যক্তি পাপ কার্য করে নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যখন অনুতপ্ত হয়ে রাসুল (সাঃ) এর শরণাপন্ন হবে এবং হুজুরের উসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণের ওয়াদা করেছেন। এখানে সন্দেহের কোন কারণ থাকতে পারে না যে পাপের জন্য অনুশোচনাকারী এবং রাসুলের (সাঃ) মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনাকারী রসুল (সঃ) এর উসিলায় ক্ষমা লাভ করবে।

এ আয়াতটির শানে নুযুলে একটা ঘটনা রয়ে গেছে; তা এই যে, বিশর নামে রাসুলের জামানায় জনৈক মুনাফেক ছিল একজন ইহুদির সঙ্গে তার কোন ব্যাপারে বিরোধ হয়। মুনাফেকটি কাআব ইব্‌নে আশরাফ নামক একজন ইহুদির কাছে এবং ইহুদি লোকটি হুজুর (সাঃ) এর কাছে বিরোধ মিমাংসার প্রস্তাব করল। সে ইহুদী হলেও হুজুর (সাঃ) কে ন্যায়, নিষ্ঠা ও সত্যবাদী বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত। হুজুর (সাঃ) উভয় পক্ষের জবান বন্দী শুনে এবং যুক্তি প্রমাণ নিয়ে ইহুদীর পক্ষে রায় প্রদান করে দিলেন। এই বিচার মুনাফেক বিশর না মেনে হযরত ওমর বিন খাত্তাবের নিকট দ্বিতীয়বার মামলা শুনানীর জন্য ইহুদিকে রাজী করলো। ধারণা ছিল হযরত ওমর কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর, তাই তিনি ইহুদিকে কঠোর শাস্তি দিয়ে মুসলমান নামধারী মুনাফেক বিশরের পক্ষে রায় দিবেন। উভয়ে বিরোধের আগাগোড়া হযরত ওমরের কাছে ব্যক্ত করা হয় এবং তিনি মনোযোগ দিয়ে উভয়ের বক্তব্য শুনলেন এবং এতে জানতে পারলেন যে স্বয়ং হুজুর (সাঃ) এই মামলার ফয়সালা ইতিপূর্বেই করে দিয়েছেন এবং ইহুদির পক্ষে রায় দিয়েছেন। তৎপর হযরত ওমর একটা নাঙ্গা তলোয়ারের আঘাতে তার শিরচ্ছেদ করে দিলেন। (ঘটনাটি ছাগাবী, ইবনে আলী হাতেম ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছের রেওয়ায়েত ক্রমে রহুল মা আনীতে বর্ণিত হয়েছে।)

নিহত মুনাফেকের ওয়ারিশ হযরত ওমরের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে মামলাও দায়ের করেছিল। কিন্তু হুজুর (সঃ) কোরআনের আলোকে এর মীমাংসা করে হযরত ওমরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে হুজুর (সাঃ) ওফাতের তিনদিন পর জনৈক গ্রামবাসী হুজুর (সাঃ) এর রওজা মোবারকের কাছে এসে পড়ে গেলেন এবং জার জার হয়ে ক্রন্দন করে উল্লেখিত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে লাগলেন, "মহান

আল্লাহতায়ালা এ আয়াত দ্বারা ওয়াদা করেছেন, যদি কোন গোনাহগার হুজুরের খেদমতে হাজির হয় এবং ক্ষমাপ্রার্থী হয় তবে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।" তখন যে সব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাদের বর্ণনা হলো এই যে, সেই করুণা প্রার্থী ব্যক্তির প্রার্থনার উত্তরে রওজা মোবারকের ভেতর থেকে একটি শব্দ বের হলো, অর্থাৎ তোমায় ক্ষমা করা হলো।" (বাহরে মুহীত)

উপরোক্ত হাদিস দ্বারা হুজুর (সাঃ) আউয়াল আখেরে হায়াতুন্নবী একথা সমগ্র মোমেন মুসলমানের জন্য একটা দলিল।

সুরা নিসার ৬৫ আয়াতে হুজুর (সাঃ) এর মহা মর্যাদা সম্পন্ন উচ্চশান ব্যাপারে স্বয়ং মহান আল্লাহতায়ালা কসম খেয়ে বলেছেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي انفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا.

উচ্চারণ: ফালা ওয়া রাব্বিকা লা-ইউমিনূনা হাত্তাইউহাককিমূকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম ছুম্মা লা-ইয়াজিদূ ফী আনফুসেহীম হারাজ্বাম মিম্মা ক্বাদাইতা ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলিমা।

"কসম সে লোক ঈমানদার হবেনা যতক্ষণ না তাদের সৃষ্ট ঝগড়া বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে (রাসুল (সাঃ) কে) ন্যায় বিচারক বলে মনে করবে এবং আপনার ফয়সালার ব্যাপারে নিজের মনে প্রাণে কোনরূপ সংকীর্ণতা না রেখে সন্তুষ্ঠ চিত্তে আপনার রায়কে কবুল করে নেবে।"

উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা এ কথা দিবালোকের মত প্রমাণ হয় যে, হুজুর (সাঃ) এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা সুস্পষ্ট কুফরী। এ আয়াতে হুজুর পাকের মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদার বিষয় ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে কোরআন শরীফের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত মহানবী (সাঃ) এর আনুগত্যের অপরিহার্য বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অধিকন্তু হুজুরের কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত মেনে না নিলে সে কখনো মোমেন হবেনা বলে স্বয়ং মহান আল্লাহতায়ালা এ মর্মে কসম খেয়েছেন। (তফসীরে মা আরেফুল কোরআন ২য় খণ্ড সুরা আন নিসা ৫২৩ পৃঃ)

সুরা আল-ইমরান ৪ রুকু ৩১ আয়াতে উল্লেখ আছেঃ

قُلْ اِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحبِبكُمُ اللهُ وَيَغفِرِ لَكُم ذُنُوبَكُم واللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

উচ্চারণ: "ক্বুল ইনকুন্‌তুম তুহিবুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহ্‌বিবকুমুল্লাহা ওয়া ইয়াগফের লাকুম জুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহীম"

অর্থ:- প্রিয় হাবীব (স:) বলুন যদি তোমরা মহান আল্লাহতায়ালাকে পাইতে চাও, তাহলে আমি রাসূল (সা:) কে ভালোবাস। মহান আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের গুনাহ্। মহান আল্লাহতায়ালা

ক্ষমাকারী অতি দয়ালু (সুরা আলে-ইমরান আয়াত ৩১)
এ আয়াত শরীফে মহান আল্লাহতায়ালা বিকল্পহীনভাবে শর্ত আরোপ করেছেন যে মহান আল্লাহতায়ালার ভালবাসা এবং তাঁর ক্ষমা লাভ করার পূর্ব শর্ত হলো নবীর অনুসরণ করা এবং তাঁকে মহব্বত করা। এখানে মহান আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন নবীর অনুসরণ এবং মহব্বত স্বয়ং মহান আল্লাহতায়ালার মহব্বত ও ক্ষমা লাভের উসিলা স্বরূপ।
মহান আল্লাহতায়ালা আরও বলেনঃ (সুরা নিসা-৫৯)

اطِيعُوا اللهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُوْلِى الامرِ مِنكُم

উচ্চারণ:"আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসুলা ওয়া উলিল্ আমরি মিন্‌কুম" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর তাবেদারী কর এবং সেই সঙ্গে আরও ঘোষণা করেছেন, তোমরা রাসুলের তাবেদারী কর। শুধু আল্লাহর তাবেদারী করলে এখানে আল্লাহর আদেশ অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে যতক্ষণ না রাসুলেরও তাবেদারী করা হয়। এ আয়াত শরীফ দ্বারা রাসুলের তাবেদারী আল্লাহর তাবেদারী করার পূর্ণ বিকাশ বা উসিলা স্বরূপ। অর্থাৎ রাসুলকে বাদ দিয়ে শুধু মহান আল্লাহকে ভালবাসার চেষ্টা করতে যাওয়া আল্লাহর আদেশের উপর ঈমান না আনার অর্থ বহন করে বা কুফরী।
সহীহ্ বুখারী হাদিস শরীফে উল্লেখ আছেঃ হাদীছ নং-১৪

لا يومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين

উচ্চারণ: আন আনাসিন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা- লা ইউ'মিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাববা ইলায়হে মিউঁ ওয়ালিদিহী ওয়া, ওয়ালাদিহী ওয়ান্নাসি আজমাঈন। (বুখারী ও মুসলিম)
অর্থ: সেই ব্যক্তি মোমেন হতে পারে না যে তার বাপ, মা, পরিবারবর্গ এবং আপন ধন সম্পত্তি হতে আমাকে (হুজুর (সাঃ) কে) অধিক মহব্বত করতে পারবে।
ফারুকে আযম হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, নিজ প্রাণাপেক্ষা হুজুর (সাঃ) এর মহব্বত প্রাণে সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তি মোমেন হতে পারবে না। এখানে পার্থিব সব কিছু হতে হুজুর (সাঃ) কে অধিক মহব্বত করা মোমেনীয়াতের দরজা লাভের উসিলা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ সমস্ত বাণী স্বয়ং হুজুর (সাঃ) এর বাণী। আর এ কথা যে অবিশ্বাস করবে সে কখনো মুসলমান নহে।
হুজুরে দোআলমকে ভালবাসা, তাঁকে প্রাণাধিক মহব্বত করা, তাঁকে এত্তেবা করা, তাঁর কথা সর্বদা মেনে চলা স্বয়ং মহান আল্লাহতায়ালার হুকুম। আর হুজুর (সাঃ) এর মহব্বত হাসেল করার উপর যে মনে প্রাণে ইনকার করলো বস্তুতঃ সে

আল্লাহর আদেশ কে অমান্য করলো। আর যে আল্লাহর আদেশ কে অমান্য করলো বস্তুতঃ সে অবিশ্বাসী মুশরিক।
রাসুল (সাঃ) এর ইশক মহব্বত হাসিল না হলে তার অন্তরে কখনো মহান আল্লাহর মহব্বত প্রবেশ করবেনা।

একবার একজন লোক এসে হুজুর (সাঃ) কে বললো, আমি গুনাহ্ করে এসেছি। আপনি আমায় দণ্ড প্রদান করুন এবং পবিত্র করুন। হুজুর চুপ করে রইলেন। নামাজের সময় হলো; নামাজ শেষে লোকটি পুনরায় একই দরখাস্ত পেশ করলো। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করলেন তুমি কি নামাজ পাঠ করোনি? উত্তর দিল হ্যাঁ পড়েছি। এরশাদ হলো মহান আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। (সহীহ বোখারী)

আউলিয়াগণের উসিলা ধরা মহান আল্লাহতায়ালার আদেশ

গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী তাঁর "সিররুল আসরার" গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ে তওবার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেনঃ
"অন্তরকে সঞ্জীবিত করার মানসে যাবতীয় কু-রিপু হ'তে মনকে পবিত্র করার জন্য ইল্মে মারেফাতের পীর বা শিক্ষক অন্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ। "তালাবুল ইল্মে ফারিদাতুন" এর উদ্দেশ্যে ইল্মে মারেফাত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জ্ঞান অন্বেষণ।"
উপরোক্ত ভাষ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার উসিলা হলো কামেল পীরের এত্তেবা করা। কোরআন এর সাক্ষী দেয়। যেমন
সুরা কাহাফের ২ রুকু ১৭ আয়াতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া রয়েছে-

وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

উচ্চারণ: "ওয়া মাই ইউদলিল ফালান তাজিদালাহু ওলিয়াম মুর্শিদা।" "মহান আল্লাহতায়ালা যাকে গোমরা বা পথভ্রষ্ট করেন সে কখনো কামেল কোন মুর্শিদকে পথ প্রদর্শকরূপে পাবে না।" মহান আল্লাহতায়ালার এ বাণীতে স্পষ্টরূপে প্রমাণ হয় যে, যার কোন মুর্শিদ নেই সে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট বা গোমরা। তা সে যতবড় কেতাবী আলেমই হোক না কেন। বড় পীর গাউসুল আযম (আঃ) কাদের জিলানী

(রঃ) বলেন- মান লায়ছা লাহু শায়খুন ওয়া শায়খুহু শায়তানুন, যার পীর নেই তার পীর শয়তান।

চার মযহাবের বিশিষ্ট ফেকহ্‌বিদ ইমামগণ ইল্‌মে মারেফাতকে ফরজ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং প্রত্যেকেই একাডেমির পুঁথিগত বই পুস্তকের ইল্‌মের সমুদ্রতুল্য হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভের উসিলা স্বরূপ পীরের খেদমত করেছেন।

ফকীহ্‌কুলের ঈমাম আযম আবু হানীফা নোমান (রঃ), হযরত ইমাম বাকের (রঃ) এবং ইমাম জাফর ছাদেক (রঃ) এর মুরিদ হয়ে ইল্‌মে তাসাওফের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। হযরত ইমাম শাফি (রঃ) সাহেবের মুর্শিদ ছিলেন হযরত সলিম রাই (রঃ), হযরত ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল সাহেবের একাধিক মুর্শিদ ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত জুননূন মিশরী (রঃ), হযরত মারুফ কারখী (রঃ) এর মুরিদ এবং পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন আমি শরীয়তের বিধি নিষেধ হযরত বশর হাফী (রঃ) অপেক্ষা বেশী অবগত। হযরত ইমাম হাম্বল, বশর হাফী (রঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে বলতেন, "হাদীছানী আন্‌ রাব্বী" আল্লাহর সম্বন্ধে আমায় শিক্ষা দান করুন। হযরত ইমাম মালেকেরও মুর্শিদ ছিলেন। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ "মোয়াত্তা" হাদিসে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি শরীয়ত পরিত্যাগ করে শুধু তাসাউফ অবলম্বন করে সে জিন্দিক বা পতিত এবং তাসাউফ বর্জন করে কেবল ফেকাহ্‌ বা শরীয়ত অবলম্বন করবে সে ফাছেক। যে উভয় ইল্‌ম অবলম্বন করবে সেই সঠিক পথে আছে।" এরূপ কাজী ছানাউল্যাহ্‌ পানি পথি (রঃ), হজরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ), হযরত গাউস পাক মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদী (রঃ) খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী আজমেরী (রঃ), ইমাম খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দি বোখারী (রঃ), হযরত মোজাদ্দিদ আলফেসানী (রঃ), হযরত ইমাম গাজ্জালি (রঃ), সৈয়দ শাহসূফী ফতেহ্‌ আলী ওয়সী রাসুলে নোমা (সাঃ), ওয়াজেদ আলী শাহ মেহেদীবাগী (রঃ), হযরত খাজা শাহ্‌ সুফী ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (রঃ), শাহ আবুল ফজল চন্দ্রপুরী (রঃ), মোফাস্‌সিরে কোরআন, মোহাদ্দিসে আকবর, কাছরে আরেফীন মহীউল সুন্নাহ মহীউল ক্বালব পীরে বে-মেছাল পীরে বে নজীর জগৎ বিখ্যাত শাইখুল হাদীস, শাহসুফী আলহাজ মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খাঁন মাতুয়াইলী (রঃ) জগতবরেণ্য প্রত্যেক অলি আল্লাহর হেদায়েতের হাদী ও মাশায়েখ অলি আউলিয়াদের পীর বা মুর্শিদ ছিলেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই মহান আল্লাহপ্রাপ্তি পথের উসিলাস্বরূপ আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী পীর অবলম্বন করেছিলেন। আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর মুর্শিদ ছিলেন খাজা আবু আলী ফারমুদী তুষী (রঃ)।

মাওলানা শাহ্ ইসমাইল শহীদ তাঁর বিখ্যাত "সিরাতে মুস্তাকীম" গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেনঃ-

"বেশাক মুর্শিদ মহান আল্লাহতায়ালা কি রাস্তেকা উসিলা হ্যায়; মহান আল্লাহ্নে ফরমায়া হ্যায় কে"- ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াবতাগু ইলাইহিল উসিলাতা ওয়া জাহাদু ফি সাবিলিহি লায়াল্লাকুম তুফলিহুন। (মায়েদা-৩৫)। অর্থাৎ "নিশ্চয়ই খোদাপ্রাপ্তি পথের উসিলা হচ্ছেন পীর বা মুর্শিদ যা সূরা মায়েদার উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন "হে ঈমানদারগণ মহান আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নিকট পৌঁছার জন্য উসিলা বা মুর্শিদ তালাশ কর এবং এই পথে কঠোর সাধনা কর যেন তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত হও।" আল্লাহর নৈকট্যের শেষ মঞ্জিলে পৌঁছার পথে চারটি জিনিসের প্রয়োজনীয়তার কথা উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমান, ভয়, উসিলা ও কঠোর সাধনা, মহান আল্লাহ প্রেমিকগণ এই আয়াতকে প্রেমিকের পথের দিশারী মনে করেন এবং উসিলা শব্দ দ্বারা মুর্শিদ বা কামেল পীরকেই বুঝে থাকেন। মাওলানা শাহ্ ইসমাইল শহীদ এর মহান মুর্শিদ ছিলেন নক্শবন্দী নেছবতের মোজাহেদে মিল্লাত ও শহীদ কুফরী শিরকের বিরুদ্ধে নিবেদিত প্রাণ কঠোরতম অগ্রনায়ক যোদ্ধা হযরত শহীদ সৈয়দ আহমেদ বেরলভী (রঃ), তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে নেতৃত্ব দিয়ে বালাকোট প্রান্তরে শাহাদত বরণ করেন।

বিদায় হজ্জের পরে আইয়্যাম তাশ্রীকের বাকী দিনগুলো অর্থাৎ ১২ই জিলহজ পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মীনাতেই অবস্থা করলেন। তারপর ১৩ই জিলহজ মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরের পর মীনা হতে রওয়ানা হয়ে 'মুহাসসাব' প্রান্তরে এসে অবস্থান করেন এবং সে রাত সেখানে অতিবাহিত করেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মহাজের ও আনসারদের সাথে মদিনায় ফিরে চললেন। রাস্তায় জোহ্ফা হতে তিন মাইল দূরে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন। সেখানে একটা পুকুর ছিল। আরবী ভাষায় পুকুরের নাম "গাদীরে খুম" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গী সকল সাহাবীদের সমবেত করে একটি খুৎবা দান করলেন। এরশাদ হলোঃ "হে লোক সকল! আমি তোমাদের নবী। এটা খুবই সম্ভব যে আল্লাহর ফেরেশতা শমন নিয়ে আমার কাছে আগমন করবেন এবং আমাকে তা মেনে নিতে হবে। (অর্থাৎ আমাকেও পরলোকের নীতি কবুল করে নিতে হবে)। আমি তোমাদের সামনে দু'টো মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি। এর একটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব বা কোরআন। এতে দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার 'আহলে বাইত' বা পরিবার পরিজন। আমি আমার আহলে বাইত সম্বন্ধে তোমাদের আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করছি। শেষ বাক্যটি তিনি তিনবার

উচ্চারণ করলেন। এটা সহীহ্ মোসলেমের বর্ণনা।" (মানাকেবে হযরত আলী) তা ছাড়া নাসাঈ মাস্নাদে আহামদ, তিরমিজী, তাবরানি, তাবারি ও হাকেমে এ সকল কিতাব ছাড়াও বর্ণিত কিছু কিতাবে উল্লেখ আছে যাতে আহ্লে বাইয়াতের প্রথম ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ) এর বিশেষ মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে।

উপরোক্ত ভাষণ এবং হাদিস সমূহে আল্লাহর কিতাব এবং আহলে বাইয়াতে রাসুলকে সমগ্র মুসলিম সমাজের জন্য উসিলা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত হাদিসসমূহে রাসুল (সাঃ) তাঁর আহলে বাইয়াতদেরকে অনুসরণ এবং মহব্বত করার জন্য তিন তিন বার কঠোর তাগিত করেছেন এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করেছেন।

(সিরাতুন্নবী ২য় খণ্ড হযরত শিবলী (রঃ)

অলি আল্লাহগণ আহলে বাইতে রাসুলের প্রতিনিধি বা ওয়ারীশ। মহান আল্লাহতায়ালা রাসুলকে তার কালামে নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই পুস্তকের প্রথম দিকে যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যারা আহলে বাইতে রাসুলের আত্মা হ'তে কোরআন ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। আহলে বাইতে রাসুলের পবিত্র আত্মায় আল্লাহর কালাম ও রাসুলের হাদিসের প্রকাশ্য ও গূঢ় রহস্যসমূহ নিহিত ছিল; এই হেতু হুজুর (সাঃ) তদীয় আহলে বাইয়াতকে অনুসরণ করার তাগিদ করে গেছেন। এটাই সিরাজাম্মনিরার তাৎপর্য।

উপরোক্ত মন্তব্যের নিরিখে আল কোরআনের দু'টো সুরার উদ্ধৃতি দেয়া হলো।
আল কোরআনের প্রথম সুরা ফাতেহা ৫ম আয়াত

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

উচ্চারণ ঃ ইহ্দিনাছ্ ছিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম।
অর্থ : "আমাদেরকে সরল পথ দেখিয়ে দাও হে প্রভু।"
আল কোরআনের প্রথম সুরা ফাতেহা ৬ষ্ঠ আয়াত

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

উচ্চারণ ঃ ছিরা-ত্বাল লাযীনা আন্-আমত্ আলাইহিম।
অর্থ ঃ "সেই সকল লোক যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ ও যারা তোমার নেয়ামতপ্রাপ্ত"
এই নেয়ামত প্রাপ্তদের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান আল্লাহতায়ালা সুরা আন নিসা ৬৯ আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ-

وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَاولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعَمَ اللهُ عَلَيهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَٱلشُّهَادَءِ وَٱلصَّلِحِينَ ج وَحَسُنَ اولَئِكَ رَفِيقًا ۔

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাই ইউত্বিইল্লাহাওয়ার রাসূলা ফাউলা-ইকা মা'আল্ লাযীনা আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহিম মিনান্ নাবিয়্যীনা ওয়াছ স্বদ্দীক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদা-ই ওয়াস্ব স্বা-লিহীন, ওয়া হাসুনা উলা-ইকা রাফীক্বা।

"মহান আল্লাহতায়ালা যাঁদেরকে নেয়ামত দান করেছেন তাঁরা হচ্ছেন আম্বিয়া, সিদ্দিক, শোহাদা ও সাদেকীন।"

এ সমস্তের ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃতি কিতাবের প্রথম দিকে আলোচনা করেছি।
এ প্রসঙ্গে তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনের প্রথম খণ্ড হতে কিছুটা অংশ সন্নিবেশ করা হলো।

আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের অনুসরণের মধ্যেই সরল পথপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। এখানে একটা বিশেষ তথ্য বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। আর এ ব্যাপারটা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জ্ঞান ভাণ্ডারের এক বাতেনী দরজা খুলে যায়। তা হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম নির্ধারণ করার জন্য বস্তুতঃ সিরাতে রাসুল ও সিরাতে কোরআন বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। উপরোক্ত দু'টো পথ চিহ্নিত করা যেমন সংক্ষিপ্ত ছিল, তেমনি ছিল সুস্পষ্ট। কেননা সমগ্র কোরআনই তো সিরাতে মুস্তাকিমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বর্ণনা।
আলোচ্য এ সংক্ষিপ্ত সূরাটির দু'টি আয়াতের সহজ ও সরল দু'টি পন্থা বাদ দিয়ে প্রথমে ইতিবাচক এবং পরে নেতিবাচক পদ্ধতিতে সিরাতে মুস্তাকিমকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন,- যদি সিরাতে মুস্তাকিমের সন্ধান চাও, তবে এ সমস্ত মহান ব্যক্তিকে তালাশ করে তাঁদের পথ অবলম্বন কর।
কেননা হুজুর (সাঃ) এ নশ্বর পৃথিবীতে দৈহিকভাবে চিরকাল অবস্থান করবেন না। তাঁর পরে আর কোনও নবী বা রাসুলের আগমন হবে না। তাই তাঁদের মধ্যে নবীগণ ছাড়াই তাঁদের প্রতিনিধি সাহাবা, খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, সিদ্দিক, শোহাদা ও সলেহীনদেরকেই অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। কারণ কেয়ামত পর্যন্ত তাদের ধারা পৃথিবীতে চলতে থাকবে। প্রকৃত তথ্য এই যে, সরল পথ অনুসন্ধানের জন্য মহান আল্লাহতায়ালা কিছু সংখ্যক মহামানুষের সন্ধান দিয়েছেন; কিন্তু হুজুরে দোআলম এক হাদিসে বর্ণনা করেছেন, আমার উম্মতগণের মধ্যে তেহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তার মধ্যে মাত্র একটি দলই হবে নাজাত প্রাপ্ত। হুজুর (সাঃ) এরশাদ করেন-

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ – اِفْتَرَقُوْا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً – وَاِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَّسَبْعِيْنَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ – وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ – وَهِىَ الْجَمَاعَةُ – رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

উচ্চারণ : ওয়া আনিন নাবিয়্যে সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সালাম। ইন্না মান কানা ক্বাবলাকুম মিন আহলিল কিতাবী। ইফতারাক্কু আলা ছিনতাইনি ওয়া সাবইনা মিল্লাতান। ওয়া ইন্না হাযিহীল উম্মাতা সাতাফতারিক্কু আলা ছালাছাতিউঁ ওয়া সাবইনা ছিনতানি ওয়া সাবউনা ফিন না-রে ওয়া ওয়াহিদাতুন ফিল জান্নাতি। ওয়া হিয়াল জামা'য়াত। (রাওয়াহু আবু দাউদ)

অর্থ : নবী করীম (সা.) বলেন: সাবধান ! তোমাদের পূর্ববতী গ্রন্থধারীগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে। আর আমার এই উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হইবে, ইহাদের ৭২ ফিরকাহ দোযখী হইবে এবং একদল বেহেশতী হইবে- এই দলই ছুন্নত ওয়াল-জামাত এর দল। (আবু দাউদ)

আমি ও আমার প্রাণপ্রিয় সাহাবীগণ যে পথে রয়েছি সে পথই সত্য ও ন্যায়ের পথ সিরাতে মুস্তাকিম। এ ধরনের বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতিতে হয়তো সে দিকে দিক নির্দেশ করা হয়েছে যে মানুষের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা কেবলমাত্র কিতাব বর্ণনা দ্বারা সম্ভব নয়, বরং চৈতন্য আধ্যাত্মিক খোদাপ্রাপ্তি পথের জ্ঞানী সিদ্ধ মহা পুরুষের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। বাস্তব পক্ষে মানুষের শিক্ষক ও অভিভাবক ঐশীজ্ঞান লব্ধ মানুষ হতে পারে। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক শুধু বই পুস্তক পাঠ করেই কেউ হতে পারে না বরং এই পুস্তকলব্ধ অভিজ্ঞ জ্ঞানী তাপসদের উপযুক্ত বাস্তব শিক্ষাতেই তা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি কিতাব এ ব্যাপারে যথেষ্ট হতো, তবে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ নবী রাসুল প্রেরণের কোন প্রয়োজনই হতো না। অতএব কিতাবের সঙ্গে নবী ও রাসুলকে শিক্ষক বা দিক নির্দেশক করে পাঠানো হয়েছে। আর সরল পথ নির্ধারণের ব্যাপারে মহান আল্লাহতায়ালা কর্তৃক স্বীয় মকবুল বান্দাদের তালিকা প্রদানও এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, শুধুমাত্র কিতাবের পাঠই পূর্ণ তালিম ও তরবিয়তের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং কোন বিজ্ঞ আধ্যাত্মিক সাধক ব্যক্তির (ঐশী শক্তিপ্রাপ্ত) নিকট হতে শিক্ষা লাভ করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট প্রমাণিত হলো, প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য দু'টোই প্রয়োজন। প্রথম আল্লাহর কিতাব, যাতে মানব জীবনের সকল দিকের পথ নির্দেশ রয়েছে এবং অপরটি হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বা মহান আল্লাহ

ওয়ালাগণ। যাঁরা সঠিক অর্থে আল্লাহর প্রিয় পাত্র স্থির হয়, তাঁদের নিকট হতে মহান আল্লাহ রাসুলের কিতাবের শিক্ষা ও হাকিকাত লাভ করে সেভাবেই আমল করতে ও জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। (তাফসীরে মা আরেফুল ১ম খণ্ড ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯ পৃষ্ঠা হতে মোটামুটি তথ্যের বর্ণনা দেওয়া হলো)।

হযরত মোজাদ্দিদ আলফে সানী তদীয় ৯৩ নং মক্তুবে লিখেছেনঃ- "মনের নিবদ্ধতায় ত্রুটির কারণ অনুসন্ধান করে এর প্রতিকারের চেষ্টা করবে। এ অবস্থায় অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ্ হয়ে ওই ত্রুটিগত অন্ধকার দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট নিজ পীরের উসিলা দিয়ে প্রার্থনা করবে।"

বিশ্ববিখ্যাত শামী (রদ্দুল মুখতার) কিতাবের প্রণেতা ফকীহ্কুল ভূষণ ছাইয়েদ মোহাম্মদ আমিন বিন আবিদীন তদীয় কিতাবের মুকাদ্দামায় রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ), ইমাম আবু হানীফাহ্ (রঃ) ও মহান অলি আল্লাহদের উসিলা দিয়ে দোয়া করেছেন। তিনি তথায় নিম্নরূপ লিখেছেন, - "নিশ্চয় আমি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর, তাঁর প্রত্যেক মর্যাদা সম্পন্ন উম্মতের এবং আমাদের পথ প্রদর্শক ইমাম আযমের উসিলা ধরে মহান আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করেছি যে, তিনি যেন তাঁর দয়াদানে আমার এ কাজ করে দেন...ইত্যাদি।"

এখানে দেখা যায় শামী প্রণেতা হযরত আমিন (রাজিঃ), হুজুর (সাঃ) এবং ঈমাম আযম (রঃ) ইন্তেকালের পরেও তাঁদের উসিলা দিয়ে দোয়া করেছেন।

হাফিজ জালালুউদ্দিন সুয়ুতির মুরিদ (শিষ্য) শায়খ মোহাম্মদ শামী "আকুদোল জামানে ফিমুনাকতে আবু হানীফাহ্ নোমান" কিতাবে লিখেছেন, -উলামা এবং অভাবগ্রস্থ লোকগণ হামেশা হযরত ইমাম আবু হানীফাহ্ (রাঃ) এর কবর জিয়ারত করতেন এবং নিজেদের অভাব মোচনের জন্য তাঁর উসিলা অবলম্বন করতেন। তারা দেখতেন যে, তাতেই তাদের অভাব মোচন হয়ে যেত। এই জিয়ারত কারীগণের মধ্যে ইমাম শাফেরী (রঃ) ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,- "আমি নিশ্চয়ই হযরত আবু হানীফাহ (রঃ) হতে বরকত লাভ করে থাকি এবং ইমাম আযমের (রঃ) কবরের পার্শ্বে বসে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে থাকি; এতে অবিলম্বেই আমার অভাব মোচন হয়ে যায়।" ইবনে হজর মক্কী শাফেয়ী ও তদীয় খাইরাতুল হাসান ফি মুনাকাতি আবি হানীফাতে নোমান কিতাবে এই ঘটনা লিখেছেন। (হাদিয়াতুল মুকাল্লিদীন ২২৭ পৃঃ)

উপরোক্ত দলিল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মহান অলি আল্লাহগণের জীবিতাবস্থায় বা তাঁদের ইন্তেকালের পরে তাঁদের উসিলা দেয়া জায়েজ ও বুযর্গানে দ্বীন তা নিজেও আমল করেছেন।

(হাকীকাতুল অসীলাহ)

মিশ্‌কাত শরীফ কিতাবুল্লিবাছ হযরত আস্‌মা বিনতে আবুবকর (রাঃ) একটি পারস্য দেশীয় সবুজ জুব্বা বের করলেন। এর কলারের উভয় পার্শ্বে রেশমী কাপড় লাগানো ছিল। তিনি বললেন, "এটি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জুববা মোবারক, ইহা হযরত আম্মাজান আয়েশা (রা) এর নিকট রক্ষিত ছিল, তাঁর ইন্তেকালের পর আমি এটা হস্তগত করেছি। হুজুর (সঃ) ইহা পরিধান করতেন। আর আমরা এখন ইহা ধৌত করে পানি পান করি, সহীহ্ হাদিস অনুযায়ী উসিলা সাব্যস্ত হয়েছে। (মোসলেম শরীফ)

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) আশ্‌য়াতুল লুমাত গ্রন্থে বাবে সউদ এর রবিয়া বিন কায়াবর সম্পর্কিত হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ "পার্থিব সমস্ত কাজ হুজুর (সাঃ) এর ইচ্ছাধীন। মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশক্রমে তিনি যাকে যা ইচ্ছা তা দান করে থাকেন। যদি ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল কামনা কর তবে তাঁর দরবারে হাজির হয়ে যা ইচ্ছা কামনা কর।" এখানে ইহকাল পরকালের মঙ্গল কামনা থাকলে দ্বীনের নবীর উসিলাতেই মহান আল্লাহতায়ালা তা তাকে দান করবেন বলে এ হাদিসে আমরা তা প্রমাণ পাই।

৪। বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে মহান আল্লাহতায়ালা বেহেশত দোযখ এবং পার্থিব ধন দৌলত এবং সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা বণ্টনের ভার হুজুর (সাঃ) এর উপর অর্পণ করেছেন অর্থাৎ তাঁর উসিলাতেই মহান আল্লাহতায়ালা মানুষকে দান করে থাকেন এবং এ মত পৃথিবীখ্যাত সমস্ত মহান আল্লাহভক্ত বুযুর্গানে দ্বীন মান্য করেন, এ ব্যাপারে তাঁদের অভিমতও বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। যেমন ইমাম আযম আবু হানীফাহ্ নোমান তার লিখিত কাছীদায়ে নোমান। এছাড়া হাদিয়াতুচ্ছানিয়া গ্রন্থে মাযমুয়ায়ে কাছায়েদ কিতাবে তাঁর কাছীদাতে; গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেছে দেহলভী (র:) আশয়াতুল লুমাত গ্রন্থে, ইমাম আহাম্মদ বিন হজর মক্কী (রঃ) মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়াত গ্রন্থে ইমাম কুছতুলানী, বিশ্ববিখ্যাত সুফী সাধক মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী মসনবীতে এবং বাংলা ভারতের বহু সংখ্যক তরীকতের সিলসিলার মহান মুর্শিদ বাংলার রুমী জামী এবং শেখ সাদীর সমকক্ষ ফার্সী সাধক ও মুর্শিদ হযরত সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রঃ) তাঁর ফার্সী কাব্য দিউয়ান-ই ওয়েসী'তে হুজুর (সাঃ) এর উসিলা মহান আল্লাহতায়ালার নিকট কত প্রিয় তা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন।

জামেউল উছুল ছুরা মোহাম্মদের তফসীরে আছে। হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহঃ), যিনি তৎকালীন বিখ্যাত তফছীরকারক ও তফছীরে কবীরের লেখক ছিলেন, তিনি হযরত নাজিমুদ্দীন কোবরা (রহঃ) এর নিকট মুরিদ হওয়ার জন্য

যান। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজীর ভিতরে এলেমের কিছুটা ফখর থাকার কারণে তিনি বলেছিলেন, আমার নিকট মুরিদ হলে তোমার এলেম ভুলে যেতে হবে অর্থাৎ মুর্খের মত থাকতে হবে। মৃত্যুর সময় ইবলিছ নানা প্রকার ছওয়াল করবে এই চিন্তা করে 'মহান আল্লাহ এক' সম্বন্ধে ৩৬০ খানা দলিল মুখস্ত করে রাখলেন। তাঁর মৃত্যুর (অন্তিমকালের) সময় ইবলিছ এসে মহান আল্লাহতায়ালার একত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন ও তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করলে, তিনি ৩৬০ খানা দলিল দ্বারা মহান আল্লাহতায়ালার একত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ করলেন। ইবলিছ যুক্তি তর্ক দিয়ে তাঁর সব দলিল বাতিল করে দেবার পর জিজ্ঞাসা করল, "হে ফখরুদ্দীন রাজী! মহান আল্লাহতায়ালার একত্ববাদের আর কি দলিল তোমার কাছে আছে? তখন হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী হতবুদ্ধি হয়ে বলেন আমি আর দলিল জানি না। যখন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন তখন তাঁর পীর ও মোর্শেদ নাজিমুদ্দীন কোবরা কাশফের মাধ্যমে জানতে পেরে ফখরুদ্দীন রাজীর প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, হে শয়তান দূর হয়ে যাও আমার খোদা বিনা দলিলে এক'। তখন ইবলিছ বলেছিল, "হে ফখরুদ্দীন রাজী, তোমার পিছনে যদি কামেল পীর ও মুর্শিদ না থাকত তবে আমি দেখতাম, তুমি কেমন করে ঈমান নিয়ে কবরে যাও।" এই ঘটনার দ্বারা জানা যায়, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজীর মত বিখ্যাত আলেম মৃত্যুকালে অলীয়ে কামেলের সাহায্য ব্যতীরেকে ঈমানের সাথে কবরে যেতে পারছিলেন না। তবে কেমন করে বর্তমান জামানার মাওলানা-মৌলভী, হাফেজ-কারী, উম্মী-পন্ডিতগণ, রাজা বাদশা, আমির উমরা, কবি সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষগণ কামেল মোর্শেদের সাহায্য ব্যতীরেকে ঈমানের সঙ্গে কবরে যেতে কিভাবে আশা করতে পারে।

বিশ্ব শামী ওয়াহুম আরবাউনা রজুলান কুল্লামা মাতা রজুলুন, আবদাল্লাহু মা-কানাহু রজুলান ইউহক্বা বিহিমুল গাইসু ওয়াইনতাসারু বিহীম আলাল আ'দা-ই-ওয়া ইউসরাফু আন আহলিশ্শামী বিহীমুল আজাবু (মিশকাত)।

অর্থঃ হযরত আলী আলাইহিস্ সালাম বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সিরিয়ায় চল্লিশ জন আবদাল আছেন। তাঁদের উসিলায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়; শত্রুদের উপর তাঁদের উসিলায় বিজয় লাভ হয় এবং তাঁদের উসিলায়ই সিরিয়াবাসীদের উপর থেকে আজাব-গজব দূরীভূত হয় (মিশকাত শরীফ) ।

আন আবদিল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহুতা'লা আনহু ইন্নালিল্লাহি তাআ'লা

সালাসা মিআতী নাফস নি আলা ক্বালবী আদা মা ওয়াল্লাহু আরবাউনা কুলুবুহুম, আলা ক্বলবী মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াল্লাহু সাবআতুন কুলুবুহুম আলা ক্বালবী ইব্রাহীমা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াল্লাহু খামসাতুন, কুলুবুহুম আলা ক্বালবী মিকাইলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াল্লাহু ওয়াহিদুন ক্বালবুহু আলা ক্বালবী মিকাইলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াল্লাহু ওয়াহিদুন ক্বালবুহু আলা ক্বালবী ইস্রাফিলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুল্লামা মাতাল ওয়াহিদু মিনাসসারাসাতি, আবদুল্লাহু মিনাসসালাতি, ওয়া কুল্লামা মাতাল ওয়াহিদু মিনাসসালাতি, আবদুল্লাহু মাকানাহু মিনাল খামসাতী ওয়াকুল্লামা মাতাল ওয়াহিদু মিনাস্সাবআতী আবদাল্লাহু মাকানাহু মিনাল আরবাইনা ওয়াকুল্লামা আলখা (রওয়াহু ইবনে আসাকীর ও মিরকাত)

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহুতা'লা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহতা'লার এমন তিনশ'জন খাস বান্দা আছেন, যাদের ক্বলব হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ক্বলবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও পাঁচজন আছেন, যাদের ক্বলব হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের ক্বলবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও তিনজন আছেন, যাদের ক্বলব হযরত মিকাঈল আলাইহিস সালামের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও একজন আছেন, যার ক্বলব হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালামের ক্বলবের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণিত ৩৫৬ জনের মধ্যে প্রথমজন ইন্তেকাল করলে, মহান আল্লাহতা'লা নিম্নস্থ তিনজন থেকে ঐ স্থান পূরণ করেন। তিনজনের মধ্যে একজন ইন্তেকাল করলে পাঁচজন থেকে, পাঁচজনের কেউ ইন্তেকাল করলে চল্লিশজন থেকে, চল্লিশজনের কেউ ইন্তেকাল করলে তিনশ'জন থেকে এবং তিনশত জনের কেউ ইন্তেকাল করলে সাধারণ অলি গণের মধ্য থেকে শুন্যস্থান পূরন করেন। তাঁদের উসিলাই আমার উম্মতের বালা মুসিবত দূরীভুত হয় (ইবনে আসাকির ও মিরকাত শরীফ)

ক্বালা সাইদু জমালু মাক্কী ফি ফাত্তাওয়াহু সুইলতু আম্মান ইয়াকুলু ফিশশিদাইদ ইয়া রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আও ইয়া শ্বাইখ আব্দুল ক্বাদির আল-জিলানী শাইয়ান লিল্লাহি আও ইয়া আলীইউন হাল হুয়া যাইজিন আমলা ফাকুতু নাআম হুয়া আমরুন মাশরুউন ওয়াউন মারগুবুন, লা ইউনকিরুহু ইল্লা মুতাকাব্বিক্ষরু আও মুয়ানিদুন ওয়াহুয়া মাহরামুন আন ফুউযিল আউলিয়া ইল্লাকিরামী ওয়া বারাকাতীহী (বাহজাতুল আসরার)।

অর্থঃ সৈয়দ জামাল মক্কী তার এক ফতোয়ায় বলেছেন, আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়ে সাহায্যের আশায় 'ইয়া রসূলুল্লাহ' অথবা 'ইয়া শেখ আবদুল কাদির শাইয়ান লিল্লাহ' অথবা 'ইয়া আলী' বলে ডাক দেয়া জায়েজ কিনা? তদুত্তরে আমার মত হচ্ছে, এরুপ সাহায্য চাওয়া শরীয়ত মোতাবেক জায়েজ ও উত্তম। অহংকারী অথবা শত্রু ব্যতীত কেউ এটা অস্বীকার করে না। যে অস্বীকার করে, সে অবশ্যই আউলিয়ায়ে কেরামদের ফয়েজ ও বরকত থেকে বঞ্চিত। (সৈয়দ জামাল মক্কী, মক্কার মুফতী)।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে-যখন হুজুর (সাঃ) ফজরের নামাজ পড়তেন তখন মদীনা শরীফের শিশুরা পাত্র সমূহে পানি নিয়ে আসতো। এবং হুজুর (সাঃ) প্রত্যেকের পাত্রে হাত মুবারক ডুবাতেন। বুঝা গেল যে, মদীনাবাসীগণ হুজুর (সাঃ) এর হাত মুবারক বরকত মনে করে রোগাক্রান্তদের আরোগ্য লাভের উসীলা মনে করতেন এবং হুজুর (সাঃ) ও তাদেরকে নিষেধ করতেন না। বরং স্বীয় হাত মুবারক পানিতে ডুবিয়ে দিতেন।

মুসলিম শরীফ ও বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যে, তারা জেহাদ করবে। তাঁরা জিজ্ঞাসিত হবে আমাদের মধ্যে রসূল করিম (সাঃ) এর সাহাবী আছে ? উত্তর দেয়া হবে-না। ওই সাহাবীর উসিলায় বিজয় লাভ হবে। বোঝা গেল যে, মহান আল্লাহ তা'লার প্রিয় বান্দাদের উসিলায় জেহাদে বিজয় অর্জিত হয়। এবং তাঁদের উসিলা গ্রহণ করার নির্দেশ রয়েছে। অত্র হাদীসে তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের উসিলার কথাও উল্লেখ আছে, অর্থাৎ আল্লাহর আউলিয়াদের উসীলায় ও বিজয় অর্জিত হয়।

নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সৃষ্টির আদি থেকেই মুসলমানরা সৎ ও পবিত্র ব্যক্তিদের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতেন।

বুজর্গানে দ্বীনের অভিমত সমূহ

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রা) মাকতুবাতের ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-যদি কামেল পীরের আশ্রয় গ্রহণে সমর্থ হও, তবে যেরূপ মৃতদেহ ধৌতকারীর হস্তে সমর্পিত হয়, তদ্রুপ পীরের দরবারে থাকবে। এরশাদুত তালেবীন ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ

"পীরের সঙ্গ লাভ করা ফরজ হবে। কারণ নায়েবে নবীর সঙ্গ লাভ মহান

আল্লাহর রাসুল ও তাঁর মহব্বতের দিকে প্রবাহিত করে।”

তাফছিরে রুহুল বয়ান, জামেউল উসুল, ছিররুল আছরার, গুনিয়াতোত্তালি-বীন, মেশকাত শরীফ, আত্তাকাশশাফ ইত্যাদিতে উল্লেখ আছে, বাতেনী এলেম শিক্ষা করা ফরজ। তাফছিরে আজিজিতে আছে, তরিকা আমল করতে হলে প্রথমে কামেল পীরের নিকট মুরিদ হতে হবে। কামেল পীরের নিকট মুরিদ হওয়া ওয়াজেব। তাফছিরে জালালাইন, আজিজি, রুহুল বয়ান, কওলুল জামিলে, ছেরাতুম মোস্তাকীমে, জখিরায়ে কেরামত, মসনবী, রেছালায়ে মক্কিয়া, নুরুন আলানুর ইত্যাদি কিতাবে আছেঃ

উচ্চারণঃ মান লাইছা লাহু শাইখুন ফা-শাইখুহুশ শাইতান।

অর্থ: যার পীর নেই, শয়তান তার পীর। হাদিছ শরীফে আছে,

الشيخ فى قومه كالنبى فى امته

উচ্চারণঃ আশ শায়খু ফি কাওমিহি কান নাবিয়্যি ফি উম্মাতি

অর্থ ঃ উম্মতের তুলনায় নবীর মর্যাদা যেমন, শায়খ ও মুর্শিদের মর্যাদাও তার সম্প্রদায়ে তেমন (মাকতুবাতে সাদী ও জিয়াউল কুলুব)।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (রঃ) মকতুবাতে ইমামে রাব্বানী কিতাবের ২য় খণ্ডে ১২৬ পৃষ্ঠায় এবং হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের আঁত তাইদুল হাক্কিকত বিল আরাতিল অতিক্কাতো উসিলা শব্দের অর্থ পীর বলে গ্রহণ করেছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা কোরআন (সুরা বনি ইসরাইল রুকু ৮, আয়াত ৭২) ফরমান- وَمَنْ كَانَ فِى هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِى الاخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَبِيْلاً

উচ্চারণ ঃ ওয়া মান্ কা-না ফী হা-যিহী আমা-ফাহুয়া ফিল আ-খিরাতি ‘আমা-ওয়া আদ্বাললু সাবীলা। সুরা বণী ইসরাইল আয়াত-৭২

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (ইহকালে) অন্ধ সে পরকালেও (বেহেস্তের পথে) অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ঠ। সুরা বনি ইসরাইল রুকু ৮, আয়াত ৭২)।

এর মূল মর্ম “তাফসিরে কবীরের” ১ম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যথা- যে ব্যক্তি ইহকালে আল্লাহর মারেফাত হতে অন্ধ, সে পরকালেও বেহেস্তের পথ হতে অন্ধ ও পথ ভ্রষ্ট হয়ে উঠবে।

উর্দু কবি ফরমানঃ

উচ্চারণ : গারতু চাহে অছলে হক আয় বেখবর।
কামেলুকা খাকে পাহো ছর বছর ।।

বঙ্গানুবাদ- হে বেখবর ! তুমি যদি আল্লাহর সহিত মিশতে চাও।
উচ্চারণ : এছ ছেফাত ক গার মেলে তুজকো গাদা।
জান ও দেলছে তোম উছপর হে ফেদা।।

অর্থ: এই গুণের গুণান্বিত কোন মিছকীনকে যদি পাও
তাঁর উপর জান ও দিল দিয়া কোরবান হও।
উচ্চারণ : এক জামানা ছোহব্বতে বা আউলিয়া।
বেহতর আজ সদ সা-লাহ্ তা'আত বে-রিয়া।
অর্থ: কিছু সময় কোন আউলিয়ার (পীরে কামেলে মোকাম্মেলের) সংসর্গে থাকা একশত বৎসরের বেরিয়া বন্দেগী অপেক্ষা উত্তম ।
উচ্চারণ : দামানে উ পীর জুদতর বেগোমা।
তারোহী আজ আফতে আখের জামা।।
অর্থাৎ: তুমি সত্বর ঐরূপ পীরে কামেলের দামান ধর, তবে আখেরী জামানার ফেৎনা ফাছাদ হতে রক্ষা পাবে। (পীরের উছিলায়)
উচ্চারণ : গরতু ছঙ্গে খারাও মরমর শুবী।
চুঁবা ছাহেব দেলরছি গাওহার শুবী

অর্থাৎ তোমার দিল যদি পাথরের ন্যায় শক্তও হয়, তুমি যদি কামেল পীরের সংসর্গ লাভ কর, তাহলে তোমার দিল পরশ পাথর (মূল্যবান পাথর) তুল্য হবে। "তুমি যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাও, তবে আউলিয়ার সংসর্গ লাভ কর বা আউলিয়ার সংসর্গে বস।"
আল ওয়াসিলাতু আহ ইয়াহি দিল আহ ইথাতু শাইখু দাখেলুন দিল তাকিয়ত হাযিহিল আয়াত।
অর্থ : জীবিতদের মধ্যে পীরের উছিলা ধরা উক্ত আয়াতের ব্যাপক অর্থের সামিল।

মসনবী শরীফে আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমী (রঃ) ফরমানঃ পীর গ্রহণ কর। কেননা, পরকালের সফর পীরহীন অবস্থায় অত্যন্ত ভয়ংকর। আর যখন পীরের দীক্ষা গ্রহণ করবে তখন তার আদেশের এমন অনুগত হয়ে যাও, যেমন হজরত

মুসা (আঃ) হজরত খাজা খিজির (আঃ) এর অনুগত হয়েছিলেন। সুতরাং যদি পীর সাহেব নৌকা ভেঙে দেন তাহলে তুমি কোন আপত্তি করোনা, যদি ছোট্ট শিশুকে বিনা দোষে কাতেল করেন তখন কোন প্রশ্ন বা আপত্তি করোনা।

মাওলানা রুমীর মতে, পীরের দামনে আবদ্ধ হওয়া ওয়াজেব জরুরী। হানাফী মাজহাবের অনুসারীদের নির্ভরযোগ্য আলেম মোল্লা আলী কারী হানাফী (রঃ) স্বরচিত কিতাব নুজহাতুল খাওয়াতের ফিতারজুমাতে শায়েখ আবদুল কাদের (রঃ) এর ১৬ পৃষ্ঠায় বলেন, হুজুর গাউছপাক (রাঃ) এরশাদ ফরমানঃ অর্থাৎ যে কেহ আমার নিকট দুঃখের মুহূর্তে সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার মুসিবত (বিপদ) দূর হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি বিপদের সময় আমার নাম নিয়ে আমাকে আহ্বান করবে তার ওই বিপদ দূর হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি আমাকে আল্লাহর নিকট তার প্রয়োজনে অসিলা গ্রহণ করবে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

এর পর মোল্লা আলী কারী (রঃ) কে হজরত গাউছ পাক (রঃ) তাঁর উসিলা গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন। মোল্লা আলী কারী (রঃ) ওই বুজুর্গ ব্যক্তিকে, যাকে দেওবন্দী খারিজীসহ তামাম পৃথিবীর সকলেই মানেন।

ফতোয়ায়ে শামির ভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইমাম শাফী (রাঃ) ফরমানঃ আমি হজরত ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মাজার শরীফ হতে বরকত অর্জন করি এবং তাঁর মাজার শরীফে আসি, যখন আমার কোন প্রয়োজনের সম্মুখীন হতে হয়, তখন আমি দু'রাকাত নামাজ আদায় করি এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মাজার শরীফের নিকট দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করি। তখন মহান আল্লাহতায়ালা মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন।

মাজহাবের এ মহান ইমাম অর্থাৎ ইমাম শাফী (রঃ) ইমামে আজম (রঃ) এর মাজার শরীফকে দোয়ার উসিলা হিসাবে গ্রহণ করতঃ সফর করে ওই স্থানে আসতেন এবং তাঁর উসিলা নিয়ে দোয়া করতেন। 'হিসনে হাসিন' শরীফে দোয়ার নিয়মাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বোখারী শরীফ ও মসনদে আযার এর বরাত দিয়ে দোয়ার এক আদবের কথা বর্ণনা করেছেনঃ দোয়ার প্রার্থনা করবে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) ও নেককার বান্দাদের উসিলা দিয়ে।

সুলতান মাহ্মুদ গজনবী (রঃ) যখন সোমনাথের উপর হামলা করতে গেলেন তখন তিনি শায়েখ আবুল হাছান খেরকানী (রঃ) এর স্বীয় জুব্বা সামনে রেখে দোয়া করলেন- মাওলা এই জুব্বা শরীফের উসিলায় বিজয় দান করুন। এবং সে বিজয় আজ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ। হজরত শায়েখ আবুল হাছান খেরকানী (রঃ) স্বীয় জুব্বা এ জন্য দান করেছিলেন যা দ্বারা উসিলা প্রমাণ হয়।

(১) হযরত গাউছে ছাকালাইন মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জীলানী বাগদাদী (রঃ)

স্বরচিত 'কাসিদায়ে গাউছিয়া' এর মধ্যে খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ বর্ণনা করে এরশাদ করেন- আমি যে দুনিয়ার উপর রাজত্ব করছি এবং আমার আওতায় জমীন ও জমান (স্থান ও কাল) মকীন (বাসিন্দা) ও মকান (স্থান)। এর কারণ হলো এ যে, প্রত্যেক ওলী কোন না কোন নবী (আঃ) এর পদাঙ্কের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং তার প্রকাশক হয়ে থাকেন।

(২) ইমামদের ইমাম অর্থাৎ ইমাম আযম আবু হানিফা (রা) "কাসিদায়ে নোমানে" এরশাদ করেন- "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমি আপনার দানের আশা রাখি এবং সৃষ্টির মধ্যে আবু হানিফার জন্য আপনি ছাড়া কেউ নেই।" বুঝা গেল যে, হানিফা (রঃ) রসুল (সাঃ) কে নিজের উসিলা মানেন।

(৩) হযরত ইমাম বুসিরী (রঃ) "কাসিদায়ে বোরদা শরীফে"- এরশাদ করেন এবং এটা হুজুর মোস্তফা (সাঃ) এর দরবারে গৃহীত হয়ঃ "যাকে রাসুলে পাক (সাঃ) সাহায্য করবেন, সে বাঘের কবল হতেও বেঁচে যায়। বোঝা গেল যে, বুজর্গ ও হুজুর (সাঃ) কে সকল মুসিবত দূরীকরণের উসিলা মানেন"।

(৪) হযরত শেখ সাদী সিরাজী (রঃ) স্বরচিত কিতাব বোস্তায় বলেন- আমি শুনেছি যে, কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহতায়ালা নেকবান্দাগণের উসিলায় পাপীদেরকে ক্ষমা করবেন।" বোঝা গেল যে, হযরত শেখ সাদী (রাঃ) ওলামায়ে কেরাম ও পুন্যবানদের উসিলায় গুনাহগারদের ক্ষমা প্রাপ্তিকে মানেন।

(৫) হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রঃ) " পন্‌দে নামা এ আত্তারে বলেন-নবী করিম (সাঃ) এমন মহান শানের অধিকারী যে, নয়টা আসমানে মেরাজ করেছেন। এবং সকল নবী (আঃ) ও ওলীগণ হুজুর (সাঃ) এর মোহতাজ বা মুখাপেক্ষী। বোঝা গেল যে, হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রঃ) হুজুর (সাঃ) কে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) ও আউলিয়া কেরামের উসিলা মানেন।

(৬) আল্লামা আবদুর রহমান জা'মী (রঃ) বলেন- 'যদি হুজুর (স.) এর নাম মোবারক উসিলা নিয়ে হযরত আদম (আ:) তওবা না করতেন তাহলে তাঁর তওবা কখনো কবুল হতো না। যদি না নূহ (আ:) হুজুর (স.) কে উসিলা গ্রহণ না করতেন তাহলে (বন্যার পানিতে) নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতেন না, বোঝা গেল যে, হযরত জামী (র.) হুজুর (স.) কে দোয়া কবুলের ও বিপদসমূহ থেকে রক্ষা পাবার উসিলা মনে করেন ।

(৭) হযরত আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমী (র) স্বরচিত মসনবী শরীফে বলেন-কবরে শায়িত অনেক বান্দা হাজার হাজার জীবিত ব্যক্তির চেয়ে অধিক উপকার করে থাকেন। তাঁদের কবরের মাটিও মানুষের উপর ছায়াদাতা। লাখো জীবিত ব্যক্তি এ কবরবাসীদের ছায়ায় রয়েছে।" বোঝা

গেল যে, মাওলানা রুমী (রহঃ) মহান আল্লাহতায়ালার প্রিয় বান্দাগণকে ওফাতের পর জীবিতদের জন্য উসিলা মানেন।

(৮) "দরুদে- এ-তাজ " যা আউলিয়া কেরাম ও ওলামা কেরামের দরুদ ওজিফা, এতে বর্ণিত আছে-

অর্থাৎ নবী করিম (সাঃ) দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের উসিলা।

(৯) আল্লামা শেখ সাদী (রঃ) নিজেকে নিজে বলেন- "হে সাদী এ ধারণাও পোষণ করুন যে, হুজুর (সাঃ) এর আনুগত্য ছাড়া আপনী হেদায়েতের রাস্তা পেতে সক্ষম হবেন না। অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ ও আমল করার পরও প্রত্যেক স্থানে হুজুর (সাঃ) এর উসিলার প্রয়োজন আছে"

উসিলা অমান্যকারীরা ও বিরোধীগণের অভিমত থেকেও পাওয়া যায় দেওবন্দীদের নেতা উসিলার উপর আকীদা রাখতেন। মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব স্বরচিত কিতাব "নায়লশ শেফা বেনানীল মোস্তাফা" এর মধ্যে বলেন যে "এ যুগ অধিক পাপের কারণে আমাদের উপর বালা মুসিবতের ভীড় জমেছে। আর অন্তর ও মুখের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়াতে তওবা ইস্তেগফার কবুল হচ্ছে না। অবশ্য যদি কোন মজবুত উসিলা হয়, তাহলে এটার বরকতে "হুজুরী ক্বালব" বা অন্তরের একাগ্রতাও অর্জিত হতে পারে এবং কবুল হওয়ার আশা করা যায়। সকল উসিলার মধ্যে বুজুর্গানে দ্বীনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হুজুর ছরওয়ারে আলম, ফখরে আলম (সাঃ) এর পবিত্র জুতার আকৃতির উসিলা অত্যন্ত বরকতময় ও ত্বরিৎ প্রভাব সম্পন্ন পাওয়া গেছে।"

মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেবের খলীফা মৌলভী আবদুল মজীদ সাহেব "মুনাজাতে মকবুল (কৃতঃ থানভী সাহেব) এর "অষ্টম হিজরী" (অষ্টম) যা তিনি বর্ধিত করেছেন ছন্দগুলো লিখেছেন " হে বেনেয়াজ (যিনি পরমুখাপেক্ষী নন) মাবুদ, যিনি আপনার খাস বান্দা মৌলভী আশরাফ আলী থানবী তার উসিলায় দোয়া কবুল করুন। এবং এ মুনাজাত ও ফরিয়াদ গ্রহণ করুন। দেখুন স্বীয় পীরের উসিলায় দোয়া করেছেন। এ হলো পীরের উসিলা।

মৌলভী কাছেম নানুতুবী সাহেব, প্রতিষ্ঠাতা মাদ্রাসা-এ-দেওবন্দ, স্বরচিত "কাসায়েদে কাসেমী" এর মধ্যে নবী করিম (সাঃ) এর দরবারে আরজ করেছেন-

'হে আল্লাহর রসুল; তোমারই ভরসার উপর আমার বন্দেগীর ভিত্তি স্থাপন করেছি। কাসেম গুনাহর কারণে হতভাগ্য এবং তার কার্যকলাপও মন্দ ।

(২) তুমি যদি আমাদের কথা জিজ্ঞাসা না কর তবে কে করবে ? তুমি ব্যতীত আমাদের দুঃখে কে দুঃখিত হবে ? দেখুন । মৌলভী কাসেম নানুতুবী সাহেব

নবী করিম (সাঃ) এর উপর ভরসা রাখছেন। এর চেয়ে মজবুত উসিলা কি হতে পারে, তৎপর তিনি বলেছেন 'ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাঃ) ! আমি খারাপ হই, পাপী হই তারপরও তো আপনার উম্মত।

আশরাফ আলী থানবী স্বীয় কিতাব "শিয়ামুল হাবীব" এর উর্দু অনুবাদ 'শিয়ামুল তীব এ নিম্নে বর্ণিত ছন্দগুলো বলেন, "হে আমার নবী (সাঃ) আমাকে সাহায্য করুন। দুঃখ দুর্দশায় আপনি আমার সাহায্যকারী, আপনি ছাড়া কোথায় আমার আশ্রয় আছে?

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ج قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ–

উচ্চারণঃ হুনা-লিকা দা'আ-যাকারিইয়্যা- রাব্বাহু, ক্বা-লা রাব্বি হাব্‌লী, মিল্ লাদুন্‌কা যুররিইয়্যাতান্ ত্বাইয়্যিবাহ, ইন্নাকা সামী উদ্ দু'আ-ই। আল কুরআনঃ সুরা আলে ইমরান, আয়াত নং-৩৮।

অর্থঃ সেখানেই যাকারিয়া (আঃ) তার প্রতিপালকের নিকট দু'আ বা প্রার্থনা করে বলল– হে আমার প্রতিপালক! আপনার তরফ থেকে আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দু'আ কবুলকারী।

নোটঃ হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম নিজে নবী হয়ে সারা জীবন কেঁদে যখন সন্তান লাভে ব্যর্থ হলেন, তখন (বৃদ্ধ বয়সে) মরিয়ম আলাইহাস্ সালাম-এর মর্যাদা (হুজরায় জান্নাতী ফল) দেখে মরিয়মের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে সন্তান চেয়ে সফল হলেন। পীর এবং উসিলার প্রয়োজনীয়তা এ দ্বারাও প্রমাণিত।

কোরআন হাদিস মতে তরীকা গ্রহণ করার গুরুত্ব

পবিত্র কুরআন হাদিসে বর্ণিত আদেশ ও নিষেধাবলীর নাম হলো শরিয়ত।

মহান আল্লাহকে চিনা বা মহান আল্লাহ্র পরিচয় পাওয়ার যে পথ তার নাম হলো তরীকত।

কুরআনে মহান আল্লাহ্ তায়ালা ফরমান-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা-খালাক্বতুল্ জিন্না ওয়াল্ ইন্সা ইল্লা-লিইয়া'বুদূন। আল কুরআন: সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত নং- ৫৬।

অর্থ ঃ জ্বীন ও ইনসানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের জন্য।

আর ইবাদত করার জন্য প্রয়োজন ইলম বা জ্ঞান। তাই মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক নারী পুরুষের জন্য ইলম তথা বিদ্যা অর্জন ফরজ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'লা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

طَلَبُ العِلمِ فَرِيضَةٌ عَلى كُلِّ مُسلِمٍ وَ مُسلِمَة

উচ্চারণ ঃ ত্বলাবুল ইলমে ফারিদাতুন আ-লা কুল্লি মুসলেমিন ওয়া মুসলিমাত।

অর্থ ঃ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর জ্ঞানার্জন ফরজ।

সুরা মায়েদা ৪৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন,

لِكُلٍّ جَعَلنَا مِنكُم شِرعَةً وَمِنهَاجًا

উচ্চারণঃ লিকুল্লিন জা'আলনা মিনকুম শির আতাওঁ ওয়া মিনহা-জাঁ।

অর্থ: তোমাদের জন্য দুটি পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, একটি শরিয়ত বা সাধারণ পথ এবং দ্বিতীয়টি হল তরিকত আমি মহান আল্লাহতায়ালাকে পাওয়ার সহজ পথ-

ইলম আবার দুই প্রকার। যথা-

ক) জাহেরী বা প্রকাশ্য ইলম, যাকে বলা হয় শরীয়ত।

খ) বাতেনী বা সির্রি বা অপ্রকাশ্য বা গোপন ইলম, যাকে বলা হয় তরীকত-মা'রিফত বা তাসাউফ।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা যেহেতু ইলম অর্জনকে 'আম' বা ব্যাপকার্থে ফরজ

করেছেন, সেহেতু উভয় প্রকার ইলম অর্জনই ফরজ হয়ে যায়। অথচ আমরা শুধু জাহেরী ইলম বা শরীয়ত মানবো, কিন্তু বাতেনী ইলম বা তরীকত মানবো না, এটা তো হতে পারে না। আল্লাহর যে কোন হুকুম না মানাই কুফরি।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন-

أَفَتُؤْمِنُوْن بِبَعْضِ الكِتَبِ وَتَكْفُرُوْن بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزىٌ

فِى الحَيَوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ القِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ العَذَابِ ط

উচ্চারণ ঃ আফাতু'মিনূনা বিবা'দ্বিল কিতা-বি ওয়া তাকফুরূনা বিবা'দ্ব, ফামা-জ্বাযু–উ মাই ইয়াফ'আলু যা-লিকা মিন্‌কুম ইল্লা-খিযইয়ুন ফিল হায়া-তিদ্ দুনইয়া, ওয়া ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ইয়ুরাদ্দূনা ইলা আশাদ্দিল আযা-ব। আল-কুরআন : সুরা বাকারা, আয়াত নং-৮৫।

অর্থ: তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা ও কিয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ، وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحقَّقَ.

উচ্চারণ ঃ মান তাফাক্কাহু ওয়া লাম ইয়াতাছাওফা ফাক্বাদ তাফসুক ; ওয়া মান তাছাউফা ওয়া লাম ইয়াতাফাক্কাহু ফাকাদ্ব তাজিনদ্দিক; ওয়া মান জামা'আ বাইনাহুমা ফাক্বাদ তাহাক্কাকা।

অর্থ: যে ব্যক্তি ইলমে শরীয়ত হাসিল করলো এবং ইলমে মা'রিফাত হাসিল করেনি সে ফাসেক, আর যে ব্যক্তি শুধু মা'রিফত বিদ্যা অর্জন করেছে কিন্তু শরিয়তের ইলম নেই, সে হচ্ছে জিন্দিক (কাফের) আর যেই ব্যক্তি উভয় প্রকার ইলম অর্জন করেছেন সেই হচ্ছে হক্বানী নায়েবে রাসুল ও হককানী কামেল পীর ও মোর্শেদ বা নবীর খাঁটি ওয়ারিশ।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَأَسبَغَ عَلَيْكُمْ نِعمَهُ, ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً–

উচ্চারণ ঃ ওয়া আস্‌বাগা 'আলাইকুম নি'আমাহু জা-হিরাতাও ওয়া বা-ত্বিনাতান।

অর্থ: তোমাদের প্রতি তাঁর (আল্লাহর) জাহেরী ও বাতেনী নিয়ামত সম্পূর্ণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, জাহেরী নিয়ামত হলো শরীয়ত আর বাতেনী নিয়ামত হলো তরীকত, মা'রিফত বা তাসাউফ।

জাহেরী বা শরিয়তের ইলম ফিকাহ শাস্ত্রে পাওয়া যায় এবং শেখার জন্য প্রয়োজন মাদ্রাসা ও ওস্তাদ। আর বাতেনী ইলম অর্জন বা তরিকতের নিয়মাবলী শিখার জন্য প্রয়োজন খানকা ও শায়খ বা পীর ও মুর্শিদ।

শরিয়তের মূল শাখা তিনটি। যথা-

ক) এলেম-জ্ঞান বা বিদ্যা;

খ) আমল-এলেম অনুযায়ী সাধনা।

গ) এখলাস-আন্তরিক বিশ্বাস / বিশুদ্ধ নিয়ত।

বুখারী শরীফের ১ম বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ

উচ্চারণ: ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়্যাত।

অর্থ: নিশ্চয় কর্মকান্ড নিয়ত অনুযায়ী সম্পাদিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ইলম ও আমল হলো শরীয়তের বিষয় আর এখলাস হলো শরীয়ত, তরীকত ও মা'রিফতের বিষয়। আর বিশুদ্ধ এখলাস অর্জনের সাহায্যকারী তরীকতে কামেল পীর বা মোর্শেদ।

হাদীসে জিব্রাঈল এর আলোকে আমাদের ধর্মের পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন-

ক) ইসলাম-কলেমা, নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, যাকাত দিবে, হজ্জ করবে।

খ) ঈমান-বিশ্বাস মহান আল্লাহকে, আসমানী কিতাবে, রাসূলগণে, কিয়ামতে, তকদিরের ভাল মন্দের উপর।

গ) এহসান-এমন করে ইবাদত করবে যেন তুমি মহান আল্লাহকে দেখছ বা অন্তত এই বিশ্বাস রাখবে মহান আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।

নোট:

১) ইসলাম ও ঈমান হলো শরিয়তের বিষয়। আর এহসান হলো তরিকতের। আমাদের জীবনে ইসলামের পূর্ণতার জন্য এহসান অবশ্যই প্রয়োজন। আর এহসান অর্জনের জন্য তরিকতের পীর মাশায়েখদের রাস্তা ব্যতিত অন্য কোথাও এহসান অর্জন করা যায় না।

২) শুধু শরীয়তের মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা আসবে না।

৩) শরীয়তকে মজবুত করার জন্যই হলো তরীকত এবং মা'রিফত।

৪) শরীয়ত হলো দুধ আর তরীকত মাখন।

৫) শরীয়ত হলো দেহ আর তরীকত প্রাণ।

৬) শুধু শরীয়তের অনুসারীরা হলো ফাসিক, আর শুধু তরীকতের অনুসারীরা হলো যিন্দিক। শরীয়ত তরীকত হাকিকত ও মারিফত নিয়েই পূর্ণতা।

৭) ইয়াকীনের স্তর ০৩টি। যথা-

ক) ইলমুল ইয়াকীন;

খ) আইনুল ইয়াকীন;

গ) হাক্কুল ইয়াকীন।

উল্লেখ্য যে, আইনুল ইয়াকীন এবং হাক্কুল ইয়াকীন অর্জনের জন্য প্রয়োজন তরীকত।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন-

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ ط وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

উচ্চারণ ঃ মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফালা-হা-দিইয়া লাহ; ওয়া ইয়াযারুহুম ফী তুগইয়া-নিহিম ইয়া'মাহূন। আল-কুরআন : সুরা আ'রাফ, আয়াত নং-১৮৬।

অর্থ: মহান আল্লাহ যাদেরকে বিপদগামী করেন তাদের কোন হাদী (পথ প্রদর্শক) নেই, আর তাদেরকে তিনি তাদের অবাধ্যতায় উৎ-ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেন।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিন হা-দ্। আল-কুরআন : সুরা আর-রা'দ, আয়াত নং-৩৩।

অর্থ: আর মহান আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন হাদী বা পথ প্রদর্শক নাই।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন-

وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ–

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাইঁ ইয়াহ্‌দিলল্লা-হু ফাহুওয়াল্ মুহতাদি, ওয়ামাই ইউদ্বলিল্ ফালান্ তাজ্বিদা লাহুম্ আওলিয়া— আ মিন্ দূনিহী ; আল-কুরআন : সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত নং-৯৭।

অর্থ: যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাঁদেরকে ব্যতিত অন্য কাউকে তাদের আওলিয়া (অভিভাবক) পাবে না।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَمَن يُّضْلِلِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ, وَلِيًّا مُّرْشِدًا.

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাই ইউদ্বিলিল্ ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ ওয়ালিয়্যাম, মুর্‌শিদা। আল-কুরআন : সুরা আল-কাহাফ, আয়াত নং-১৭।

অর্থ: এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী মুর্শিদ (অভিভাবক) পাবে না।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَمَن يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ, مِنۡ هَادٍ.

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিন হা-দ্। আল-কুরআন : সুরা আয-যুমার, আয়াত নং-২৩।

অর্থ: আর মহান আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন হাদী (পথ প্রদর্শক) নাই।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন-

وَمَن يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ, مِنۡ هَادٍ.

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিন হা-দ্। আল-কুরআন : সুরা আয-যুমার, আয়াত নং-৩৬।

অর্থ: মহান আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন হাদী (পথ প্রদর্শক নাই)

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন

وَمَن يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ, مِنۡ هَادٍ.

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিন হা-দ্।

আল-কুরআন : সুরা আল-মু'মিন, আয়াত নং-৩৩।

অর্থ: মহান আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন হাদী বা পথ প্রদর্শক নাই

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَمَن يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ, مِن وَلِيٍ مِنْ بَعْدِهِ–

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ, মিওঁ ওয়া লিয়্যিম মিম্ বাদিহী। আল-কুরআন : সুরা শুরা, আয়াত নং-৪৪।

অর্থ: মহান আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তৎপর তার জন্য কোন অলী (অভিভাবক) নাই।

পবিত্র কুরআন ব্যতিত তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের কোন আউলিয়া (অভিভাবক) থাকে না এবং মহান আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন গতি নাই।

وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَولِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللهِ وَمَن يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ.

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা-কা-না লাহুম মিন্ আওলিয়া–আ ইয়ানসুরূনাহুম্ মিন্ দূহিল্লা-হি : ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ-মিন্ সাবীল। আল-কুরআন : সুরা আশ-শুরা, আয়াত নং-৪৬।

উপরোক্ত ৯টি আয়াত দ্বারা বুঝা গেল হাদী, আউলিয়া, মুর্শিদ এবং পীরের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আউলিয়া সহবত হাসিল করলে, আনুগত্য করলে, সম্মান করলে মহান আল্লাহ্র যিকির হয়ে যায়, চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে এবং নসিব বুলন্দ হয়। তাই আমাদের উচিত উপযুক্ত 'হাদী'র সন্ধান করে তাঁর কাছ থেকে আল্লাহর পরিচয় লাভের পথ তথা তরীকতের দীক্ষা নেওয়া এবং তাঁর অনুসরণ করা।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ط

উচ্চারণ ঃ ইন্না রাব্বাকা আহা-ত্বা বিন্না-সি। আল-কুরআন : সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং-৬০।

অর্থ: নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

وَنَحنُ اَقرَبُ اِلَيهِ مِن حَبْلِ الوَرِيدِ

উচ্চারণ ঃ ওয়া নাহনু আক্বরাবু ইলাইহি মিন্ হাবলিল ওয়ারীদ্। আল-কুরআন : সুরা ক্বফ, আয়াত নং-১৬।

অর্থ: আমি বান্দার শাহরগ (মেরু রজ্জু) হতেও নিকটে আছি।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

وَاعلَمُوا اَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ

উচ্চারণ ঃ ওয়া'লামু-আন্নাল্লা-হা ইয়াহুলু বাইনাল মার্‌ই ওয়া ক্বাল্‌বিহী। আল-কুরআন : সূরা আল-আনফাল, আয়াত নং-২৪।

অর্থ: মহান আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী হয়ে থাকেন।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন।

فَاِنِّى قَرِيبٌ ط اُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لا

উচ্চারণ ঃ ফাইন্নী ক্বারীব ; উজ্বীবু দা'ওয়াতাদ্ দা-ই ইযা-দা'আ-নি। আল-কুরআন : সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১৮৬।

অর্থ: আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اِن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحيًا اومِن وَراى حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً

فَيُوحِىَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ.

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা-কা-না লিবাশারিন্ আই ইউকাল্লিমাহুল্লা-হু ইল্লা-ওয়াহইয়ান, আও মিওঁ ওয়ারা-ই হিজ্বা-বিন্ আও ইউর্‌সিলা রাসূলান্ ফাইউহিয়া বিইয্‌নিহী মা-ইয়াশা-উ। আল-কুরআন : সুরা শুরা, আয়াত নং-৫১।

অর্থ: মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, মহান আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যমে ব্যতিত অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া এবং এমন দূত প্রেরণ ব্যতিত, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ–

উচ্চারণ ঃ ওয়া-ফী-আন্‌ফুসিকুম ; আফালা-তুবস্বিরূন। আল-কুরআন : সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত নং-২১।

অর্থ: আমার নিদর্শন তো তোমাদের মধ্যে। তোমরা কি তা দেখ না? বা আমি তো তোমাদের সীমানার (আনফাস) মধ্যেই আছি, তোমরা কি তা দেখ না?

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

اِنَّ رَبِّى قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ.

উচ্চারণ ঃ ইন্না রাব্বী ক্বারীবুম্ মুজীব। আল-কুরআন : সুরা হুদ, আয়াত নং-৬১।

অর্থ: নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটে, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

وَمَن كَانَ فِى هَٰذِهِ اعمَىٰ فَهُوَ فِى الأَخِرَةِ اَعمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً.

উচ্চারণ ঃ ওয়া মান্ কা-না ফী হা-যিহী-আ'মা-ফাহুওয়া ফিল আ-খিরাতি আ'মা-ওয়া আদ্বাললু সাবীলা। আল-কুরআন : সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং-৭২।

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি এইখানে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন।

الَّذِينَ كَانَت أَعيُنُهُمْ فِى غِطَاءٍ عَن ذِكرِى وَكَانُوا لاَ يَستَطِيعُونَ سَمعًا.

উচ্চারণ ঃ আল্লাযীনা কা-নাত আ ইউনুহুম্ ফী গিত্বা-ইন্ আন্ যিকরী ওয়া কা-নূ ল্া-ইয়াস্তাত্বী'উনা সাম্'আ। আল-কুরআন : সুরা কাহাফ, আয়াত নং-১০১।

অর্থ ঃ যাদের চক্ষু অন্ধ আমার নির্দশনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

فَإِنَّهَا لاَ تَعمَى الأَبصَرُ وَلَكِن تَعمَى القُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ.

উচ্চারণ ঃ ফাইন্নাহা-লা-তা'মাল্ আবস্বা-রু ওয়া লা-কিন্ তা'মাল্ কুলুবুল্লাতী ফিস্বস্বুদূর। আল-কুরআন : সুরা আল হাজ্জ, আয়াত নং-৪৬।

অর্থ: বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন।

فِى قُلُوْبِهِم مَّرَضٌ

উচ্চারণ ঃ ফী কুলুবিহিম মারাদুন। সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১০।

অর্থ: (ধর্মদ্রোহীদের) ক্বলবে রয়েছে অসুখ। তাই তারা মহান আল্লাহকে চিনে না।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وانْتُم مُّسلِمُونَ.

উচ্চারণ ঃ ইয়া-আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্ তাকুলল্লা-হা হাক্বক্বা তুক্বা-তিহী ওয়া লা-তামূতুন্না ইল্লা ওয়া আন্তুম মুসলিমূন। আল-কুরআন : সুরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১০২।

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা মহান আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

قَدْ اَفلَحَ مَنْ زَكّٰهَا – وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

উচ্চারণ ঃ ক্বাদ্ আফ্লাহা মান্ যাক্কা-হা। ওয়া ক্বাদ্ খা-বা মান্ দাস্সা-হা। আল-কুরআন : সুরা আশ-শামস্, আয়াত নং-৯-১০।

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা সেটাকে (রুহকে) জাগ্রত করেছেন তারাই শুধু মুক্তি লাভ করেছেন। আর তারা ধ্বংস হয়েছে, যারা (রুহকে) মাটি চাপা দিয়ে রেখেছেন।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كافةً.

উচ্চারণ ঃ ইয়া-আইয়্যাহাল্লাযীনা আ-মানুদ্ খুলু ফিস্ সিল্মি কা-ফ্ফাহ। আল-কুরআন : সুরা আলা-বাকারা, আয়াত নং-২০৮।

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

اِلاَّ مَنْ اتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

উচ্চারণ ঃ ইল্লা-মান্ আতাল্লা-হা বিক্বালবিন্ সালীম। আল-কুরআন : সুরা শু'আরা, আয়াত নং-৮৯।

অর্থ: পরিচ্ছন্ন দিল ছাড়া আল্লাহর দরবারে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন,

فَاذكُرُونِى اَذكُركُم وَاشكُرُوالِى وَلاَ تَكفُرُونِ.

উচ্চারণ ঃ ফায্কুরূনী আয্কুর্কুম্ ওয়াশ্কুর্লী ওয়ালা-তাক্ফুরূন। আল-কুরআন : সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১৫২।

অর্থ: সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন।

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِع غَيرَ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا

تَوَلَّى وَنُصلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيرًا

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাই ইউশা-ক্বিক্বির্ রাসূলা মিম্ বা'দি মা-তাবাইয়্যানা লাহুল্

হুদা-ওয়া ইয়াত্তাবি' গাইরা সাবীলিল্ মু'মিনীনা নুওয়াল্লিহী, মা-তাওয়াললা-ওয়া নুস্বলিহী জ্বাহান্নাম ; ওয়া সা্-আত্ মাস্বীরা। আল-কুরআন : সুরা আন-নিসা, আয়াত নং-১১৫।

অর্থ: কারো নিকট সৎপথ প্রকাশের পর সে যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে বা মুমিনদের পথ ব্যতিত অন্য পথ অনুসরণ করে- জাহান্নাম তাদের দগ্ধ করবে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا اِذَا مَا اتَّقَوا وَّامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَلِحَتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّاحسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ المُحسِنِينَ.

উচ্চারণ ঃ লাইসা 'আলাল লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি জুনা-হুন্ ফীমা-ত্বা'ইমূ-ইযা-মাত্তাক্বাও ওয়া আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ছুম্মাত্তাক্বাওঁ ওয়া আ-মানূ ছুম্মাত্তাক্বাওঁ ওয়া আহসানূ; ওয়াল্লা-হু ইউহিব্বুল মুহসিনীন।

আল-কুরআন : সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং-৯৩।

অর্থ: যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম (আমলে ছালেহা) করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তাদের কোন গুণাই নাই, তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে এবং মহান আল্লাহ সৎকর্ম পরায়নদিগকে ভালোবাসেন।

ঈমান, সৎকর্ম ও তাকওয়ার সাথে এহসানও আবশ্যক। কারণ এহসান ব্যতিত সূফী, মোহসীন কিংবা আউলিয়া হওয়া যায় না। আর এহসানের জন্য তরীকত প্রয়োজন। সুরা বাকারার ১১২নং আয়াত অনুযায়ী মোহসীন ও সূফীগণ জান্নাতি।

মহান আল্লাহতায়ালাকে চেনা, আল্লাহর পরিচয় লাভ, দিলকে পরিচ্ছন্ন করা, রুহ ও অন্তর চক্ষুকে জাগ্রত করা, আল্লাহর যিকিরকে দায়েমী করা, পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হওয়া, দিলে হুজুরী বা একাগ্রতা সৃষ্টি করা, দিলে আল্লাহর ভয় ও মহব্বত সৃষ্টি করা, এহসান ও এখলাস অর্জন করা- এ সবের জন্যই প্রয়োজন তরীকত। মহান আল্লাহ যেহেতু সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলেন না, তাই আমাদের উসিলা অবলম্বন আবশ্যক।

বর্ণমালা হতে শব্দ চয়ন করতে যেমন একজন শিক্ষক প্রয়োজন, তেমনি বর্ণিত বিষয়গুলো আয়ত্ত্ব করতেও একজন ওস্তাদ, পীর ও মোর্শেদের প্রয়োজন।

যুগে যুগে সত্যকে জানার জন্য প্রত্যেকেই কামেল মুর্শিদ বা গুরুর কাছে বাইয়াত, শিক্ষা-দীক্ষা ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন

০১। সত্যকে জানার জন্য প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে সিদ্দীকে আকবর আবু বকর (রাঃ) বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

০২। সত্যকে জানার জন্য সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে হযরত সালমান ফারছী (রাঃ) বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

০৩। সত্যকে জানার জন্য গাউসুল আজম বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদী (রাঃ) তার মুর্শিদ হযরত আবু সাঈদ আল মাখজুমী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

০৪। সত্যকে জানার জন্য গরীবে নেওয়াজ খাজা মাঈনুদ্দিন হাসান চিস্তী আজমেরী গরীবে নেওয়াজ খাজায়ে খাজেগান হযরত ওসমান হারুনী (রঃ)-এর কাছে মুরিদ হলেন।

০৫। সত্যকে জানার জন্য শামছুল আরেফীন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দী (রঃ) তার পীর ও মুর্শিদ হযরত শাহ সৈয়দ আমীর কালাল (রঃ)-এর কাছে বাইয়াত বা মুরিদ হলেন।

০৬। সত্যকে জানার জন্য ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামানী, গাউছে ছামদানী হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফে ছানী (রঃ) তাঁর পীর হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (কুঃ ছিঃ আঃ) এর কাছে বাইয়াত বা মুরিদ হলেন।

০৭। সত্যকে জানার জন্য হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তাঁর মুর্শিদ ইমাম বাকের (রঃ)-এর কাছে মুরিদ হলেন।

০৮। সত্যকে জানার জন্য হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ)-এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

০৯। সত্যকে জানার জন্য হযরত ইমাম মালেক (রঃ) তার পীর হযরত নাফেই (রঃ)-এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

১০। সত্যকে জানার জন্য হযরত ইমাম শাফী (রঃ) হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

১১। সত্যকে জানার জন্য শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে হযরত হাসান বসরী (রঃ) বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

১২। সত্যকে জানার জন্য হযরত রাবেয়া বসরী (রাঃ) হযরত হাসান বসরী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

১৩। সত্যকে জানার জন্য শাহ ফতেহ আলী ওয়াইসী রাসুলে নোমা, হযরত নূর মুহাম্মাদ নিজাম (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

১৪। সত্যকে জানার জন্য শাহ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ) হযরত শাহ ফতেহ আলী ওয়াইসী রাসুলে নোমার কাছে মুরিদ হলেন।

১৫। সত্যকে জানার জন্য খাজা ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (রঃ) শাহ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগীর কাছে মুরিদ হলেন।

১৬। সত্যকে জানার জন্য সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী (রঃ) খাজা ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

১৭। সত্যকে জানার জন্য মোফাসসিরে কোরআন হযরত কুতুবুদ্দিন আহমদ খান মাতুয়াইলী (রঃ) হযরত শাহ চন্দ্রপুরী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

১৮। সত্যকে জানার জন্য আমি মোঃ জাকির মুরিদ হলাম মোফাসসিরে কোরআন শাহসূফী আলহাজ মাওলানা কুতুবুদ্দিন আহমদ খান শাহ মাতুয়াইলী (রঃ) এর কাছে ।

১৯। সত্যকে জানার জন্য ছারশীনার পীর হযরত নেছার উদ্দিন (রঃ) হযরত আবু বকর (রঃ) এর কাছে মুরিদ হন।

২০। সত্যকে জানার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত শাহ ফতেহ আলী ওয়াইসী রাসুলে নোমার কাছে মুরিদ হন।

২১। সত্যকে জানার জন্য বোখারী শরীফ অনুবাদকারী হযরত শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) হযরত আশরাফ আলী থানভীর কাছে মুরিদ হন।

২২। সত্যকে জানার জন্য হযরত আশরাফ আলী থানভী সাহেব হযরত এমদাদুল্লাহ মহাজেরে মক্কীর (রঃ) কাছে মুরিদ হন।

২৩। সত্যকে জানার জন্য ঢাকা লালবাগ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ্জী হুজুর (রঃ) হযরত আশরাফ আলী থানবী সাহেবের কাছে মুরিদ হন।

২৪। সত্যকে জানার জন্য হযরত জাফর সাদেক (রাঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত কাশেম ইবনে মোহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক (রঃ) কাছে।

২৫। সত্যকে জানার জন্য হযরত জাফর সাদেক (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ)।

২৬। সত্যকে জানার জন্য হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত আবুল হোসেন খেরকানী (রঃ)।

২৭। সত্যকে জানার জন্য হযরত আবুল হোসেন খেরকানী (রাঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী (রঃ)।

২৮। সত্যকে জানার জন্য হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত খাজায়ে খাজেগান আব্দুল খালেক আজদেদানী (রঃ)।

২৯। সত্যকে জানার জন্য হযরত খাজায়ে খাজেগান আব্দুল খালেক আজদেদানী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত খাজা মাওলানা আরিফ রেওগিরী (রঃ)।

৩০। সত্যকে জানার জন্য হযরত খাজা মাওলানা আরিফ রেওগিরী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত খাজা মাহামুদ আনজীর ফাগনবী (রঃ)।

৩১। সত্যকে জানার জন্য হযরত খাজা মাহমুদ আনজীর ফাগনবী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত শাহ্ আজীজানে আলী আর্‌রামায়েতানী (রঃ)।

৩২। সত্যকে জানার জন্য হযরত শাহ্ আজীজানে আলী আর্‌রামায়েতানী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত খাজা মাওলানা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছী (রঃ)।

৩৩। সত্যকে জানার জন্য হযরত খাজা মাওলানা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত শাহ্ আমীর কালাল (রঃ)।

৩৪। সত্যকে জানার জন্য শামছুল আরেফীন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দি (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রঃ)।

৩৫। সত্যকে জানার জন্য হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ)।

৩৬। সত্যকে জানার জন্য হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ) এর কাছে

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (রঃ)।

৩৭। সত্যকে জানার জন্য হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন শাহ্সূফী জাহেদ ওয়ালী (রঃ)।

৩৮। সত্যকে জানার জন্য শাহ্সূফী জাহেদ ওয়ালী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত শাহ্ দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ)।

৩৯। সত্যকে জানার জন্য হযরত শাহ্ দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত মাওলানা শাহ্সূফী খাজেগী এমকাঙ্গী (রঃ)।

৪০। সত্যকে জানার জন্য হযরত মাওলানা শাহ্সূফী খাজেগী এমকাঙ্গী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত খাজা মুহাম্মাদ বাকী বিল্লাহ (রঃ)।

৪১। সত্যকে জানার জন্য ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামানী, গাউছে ছামদানী, হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফে ছানী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত শেখ সৈয়দ আদম বিননূরী (রঃ)।

৪২। সত্যকে জানার জন্য হযরত শেখ সৈয়দ আদম বিননূরী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী (রঃ)।

৪৩। সত্যকে জানার জন্য হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত মাওলানা শেখ আব্দুর রহিম মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)।

৪৪। সত্যকে জানার জন্য হযরত মাওলানা শেখ আব্দুর রহিম মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত মাওলানা শাহ্ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)।

৪৫। সত্যকে জানার জন্য হযরত মাওলানা শাহ্ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (রঃ)।

৪৬। সত্যকে জানার জন্য ফকির লালন শাহ তার পীর ও মুর্শিদ সিরাজ সাঁইয়ের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

৪৭। সত্যকে জানার জন্য বাবা লোকনাথ ভট্টচারী তার পীর ও মুর্শিদ গফুর সাঁইয়ের কাছে মুরিদ হন।

৪৮। সত্যকে জানার জন্য ভারত বর্ষের বিখ্যাত গুরু নানক তার পীর বাবা বাহালুলদানা (রঃ) কাছে মুরিদ হন।

৪৯। সত্যকে জানার জন্য পারস্যের মহাকবি 'মসনবী শরীফ' এর লেখক হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন হযরত শাম্‌স তাবরীজ (রঃ) এর কাছে।

৫০। সত্যকে জানার জন্য তাফসীরে কবীরের লেখক ইমাম ফখর উদ্দিন রাজী (রঃ) হযরত নজিমুদ্দীন কোবরার কাছে মুরিদ হন।

৫১। সত্যকে জানার জন্য হযরত বু-আলী শাহ কলন্দর (রঃ) হযরত শেখ ফরিদ (রঃ) এর কাছে মুরিদ হন।

৫২। সত্যকে জানার জন্য হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রঃ) হযরত শেখ ফরিদ (রঃ) এর কাছে মুরিদ হন।

৫৩। সত্যকে জানার জন্য হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রঃ) হযরত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশ্‌তী আজমেরী হাছান শানজেরী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হন।

৫৪। সত্যকে জানার জন্য মোল্লা আলী ইবনে হাজার (রঃ) আল হাইছামী আল ফকীহ (রঃ) এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

৫৫। সত্যকে জানার জন্য বা গুপ্ত ইল্‌ম শিক্ষার জন্য হযরত মুসা (আঃ) হযরত খাজা খিজির (আঃ) এর কাছে গেলেন।

৫৬। সত্যকে জানার জন্য সুলতান মাহমুদ গজনবী (রঃ) হযরত আবুল হাছান খেরকানী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

৫৭। সত্যকে জানার জন্য হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ) এর কাছে হযরত আবু বকর শিবলী (রঃ) মুরিদ হলেন।

৫৮। সত্যকে জানার জন্য হুমায়ুন মানসুর হাল্লাজ (রঃ) হযরত আব্দুল্লাহ তশতরী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

৫৯। সত্যকে জানার জন্য তাফসীরে জালালাইন শরীফের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ), হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

৬০। সত্যকে জানার জন্য অসাধারণ তত্ত্বদর্শী, তাপসকূল শিরোমনী (রঃ) হযরত সাররী সাকতী (রঃ) হযরত আহমদ হাওয়ারী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

৬১। সত্যকে জানার জন্য হযরত মা'রূফ কারখী (রঃ) হযরত দাউদ তায়ী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

৬২। সত্যকে জানার জন্য হযরত সিররী সাকতী (রঃ) হযরত মা'রূফ কারখী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

৬৩। সত্যকে জানার জন্য শায়েখ আবু বকর কেতানী (রঃ) হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

৬৪। সত্যকে জানার জন্য হযরত আবু আলী জুরজানী (রঃ) খোরাসানের বিখ্যাত তাপস হযরত মুহাম্মদ আলী হাকীম তিরমিজী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হলেন।

৬৫। সত্যকে জানার জন্য হযরত আহমদ মাসরুক (রঃ) হযরত সিররী সাকতী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হন।

৬৬। সত্যকে জানার জন্য হযরত শেখ ফরিদ (রঃ) হযরত বখতিয়ার কাকী (রঃ) এর কাছে মুরিদ হন।

৬৭। সত্যকে জানার জন্য দার্শনিক প্লেটো শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস এর কাছে।

৬৮। সত্যকে জানার জন্য বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন প্লেটোর কাছে।

৬৯। সত্যকে জানার জন্য বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন আরখ এখলাছ এর কাছে।

৭০। সত্যকে জানার জন্য স্যার আইজাক নিউটন শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন দার্শনিক আইজাক ব্যারোর কাছে।

৭১। সত্যকে জানার জন্য দার্শনিক ও বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটলের কাছে।

এ বিধান সৃষ্টির আদি হতে কেয়ামতাবদি চালু থাকবে।

মহান আল্লাহতায়ালার জিকিরের গুরুত্ব

প্রথম অধ্যায়

'জিকির' অর্থ স্মরণ। 'জিকরুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর জিকির বা আল্লাহর স্মরণ। ঈমান, ইসলাম, হেদায়েত ও দ্বীন-ধর্ম– শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর জিকিরকে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রথমে নিজেদের অন্তরে বাহিরে, পরে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে– এভাবে সারা বিশ্বে।

কোরআনুল করীমও আল্লাহর জিকির। অর্থাৎ কোরআন আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন– إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ ইন্না নাহনু নাজজালনাজ জিকরা....' (আমিই এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি)– সূরা হিজর, আয়াত ৯। আবার কোথাও জ্ঞান অর্থেও জিকির শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- فَسئَلُوا اهلَ الذِّكرِ 'ফাসআলু আহলাজ জিকরি' (জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস করো)–সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৭)।

এভাবে নামাজও আল্লাহর জিকির। কেননা নামাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আল্লাহর জিকিরকে প্রতিষ্ঠা করা। যেমন বলা হয়েছে, اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكرى 'আক্বিমিস সলাতা লি জিকরি' (নামাজ প্রতিষ্ঠা করো আমার স্মরণের জন্য)– সুরা ত্বহা, আয়াত ১৪।

এভাবে শরীয়তের সকল হুকুম আহকামের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখবো সকল আমলের মূল বা ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর জিকির। আল্লাহর জিকির ব্যতীত কোনো আমলই মহান আল্লাহপাকের দরবারে গৃহীত হয় না। যেমন– হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, একাগ্রচিত্ততা (হুজুরী ক্বলব) ছাড়া নামাজ হয় না। হুজুরী কলব অর্থ যে ক্বলব নামাজে হাজির বা উপস্থিত থাকে। যে ক্বলবে আল্লাহর জিকির থাকে, সেই ক্বলবই তো হুজুরী ক্বলব। ক্বলবে আল্লাহর জিকির না থাকলে গাইরুল্লাহর জিকির থাকবে। আর গাইরুল্লাহর (মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর) স্মরণমগ্ন থাকলে নামাজ হবে কীভাবে।

সুতরাং বুঝতে হবে ক্বলবে মহান আল্লাহপাকের সার্বক্ষণিক জিকির থাকা ইবাদত বন্দেগী কবুল হওয়ার একটি শর্ত। বরং প্রধান শর্ত। তাই কোরআন মজীদের অনেক আয়াতে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

আমরা সেই সকল আয়াতের যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ প্রথমে জেনে নেই। তারপর পরবর্তী আলোচনা-পর্যালোচনায় প্রবেশ করবো ইনশাআল্লাহু তায়ালা।

উল্লেখ্য, এখানে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো 'তাফসীরে মাযহারী' থেকে।

فَاذْكُرُونِى اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوالِى وَلَا تَكْفُرُونِ.

উচ্চারণঃ ফাযকুরূনী আয্কুর্কুম্ ওয়াশ্কুরূলী ওয়ালা-তাক্ফুরূন।

(সুতরাং তোমরা শুধু আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না)– সুরা বাকারা আয়াত ১৫২।

ব্যাখ্যাঃ পরম তত্ত্বের (মহান আল্লাহতায়ালার) পরিচিতি (মারেফাত) লাভ হয় অন্তরের বিবর্তন ও অলৌকিক প্রাপ্তির মাধ্যমে। অধিক জিকির ও মোরাক্বাবা ওই প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে। সেই জিকির ও মোরাক্বাবা সম্মিলিতভাবে হোক অথবা হোক এককভাবে। সেই জিকিরের প্রতি এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে এভাবে– 'ফাজকুরূনী (তোমরা শুধু আমাকেই স্মরণ করো)। এরপর বলা হয়েছে 'আজকুরকুম' (আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো)।

আবু শাইখ এবং দায়লামী 'মসনদে ফিরদাউস' গ্রন্থে জোবায়েরের মাধ্যমে তিনি জুহাকের মাধ্যমে এবং তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ফাজকুরূনী আজকুরকুম' আয়াতের শানে এরশাদ করেছেন– মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে বান্দাসকল! তোমরা আমাকে ইবাদতের মাধ্যমে স্মরণ করো। আমি মাগফিরাতসহ তোমাদেরকে স্মরণ করবো। অর্থাৎ তোমরা আমার ইবাদত করো–আমি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবো।

হজরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন– আমার বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার সেই ধারণার অনুকূল। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমিও তাকে স্মরণ করি। সে যদি কোনো অনুষ্ঠানে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি অধিকতর উত্তম অনুষ্ঠানে। সে যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে অর্ধ হাত এগিয়ে আসে, তবে আমি এগিয়ে যাই একহাত। সে একহাত এলে আমি যাই দুই হাত। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, তবে আমি যাই দৌড়ে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস (রা). থেকে বাগবীও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার সাথে এই উক্তিটিও রয়েছে যে, হজরত আনাস (রা.) বলেছেন, নিজের পাঁচটি আঙ্গুল গণনা করার মতো স্পষ্টরূপে এই হাদিসটি আমি রাসুলুল্লাহর কাছ থেকে শুনেছি।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলেপাক (সা.) এরশাদ করেছেন, মানুষের অন্তর দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। এক কক্ষে থাকে ফেরেশতা, অপর কক্ষে থাকে শয়তান। যখন মানুষ মহান আল্লাহ তায়ালার জিকির করে তখন শয়তান তার কুঠুরী ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর যখন জিকির থেকে অমনোযোগী হয়, তখন শয়তান তার ঠোঁট অন্তরে প্রবেশ করিয়ে কুমন্ত্রণা দেয়। (ইবনে আবী শায়বা)

অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা দূর করার নামই জিকির। জিকির না করার কারণেই অন্তর কঠিন হয়। উল্লেখ্য, শরীয়ত সমর্থিত কথা, কর্ম, চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা– এ সকল কিছুই জিকিরের অন্তর্গত। তবে শর্ত হচ্ছে, এ সব কিছুই হতে হবে বিশুদ্ধ অন্তর সহযোগে। অসৎ উদ্দেশ্য ও অমনোযোগিতার সাথে সম্পাদিত আমল মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে গৃহীত হয় না। মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

قَدْ اَفلَحَ الْمُؤمِنُونَ ۚ الَّذِينَ هُمُ فِى صَلاَتِهِم خَشِعُونَ.

উচ্চারণ ঃ ক্বাদ্ আফলাহাল মু'মিনূন। আল্লাযীনা হুম ফী স্বালা-তিহিম খা-শিউন।

(অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে মু'মিনগণ, যাহারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে)। সুরা মু'মিনূন, আয়াত ১, ২।

আরো এরশাদ করেন– الَّذِينَ هُم عَن صَلاَتِهِم سَاهُونَ ۙ الَّذِينَ هُم يُراءُونَ ۙ

উচ্চারণঃ আল্লাযীনা হুম আন স্বালা-তিহিম সা-হূন। আল্লাযীনা হুম ইউরা-উনা।

(সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন)। সুরা মাউন, আয়াত ৪, ৫।

الَّذِينَ يَذكُرُونَ اللهَ قِيَامً وَّقُعُودً وَّعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُوْن فِى خَلقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَالارضِ

رَبَّنَا مَا خَلَقتَ هَذَا بَطِلاً ۚ سُبحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار–

উচ্চারণ ঃ আল্লাযীনা ইয়ায্‌কুরূনাল্লা-হা ক্বিইয়া-মাওঁ ওয়া কু'উদাওঁ ওয়া 'আলা-জুনুবিহিম ওয়া ইয়াতাফাক্কারূনা ফী খালক্বিস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বে, রাব্বানা মা-খালাক্বতা হাযা বা-ত্বিলা, সুবহানাকা ফাক্বিনা- আযাবান্-নার।

(যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহর স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা কর)। সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৯১।

ব্যাখ্যাঃ যাঁরা প্রকৃত আলেম, তাঁরা দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে– সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকেন। জ্ঞানীগণের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। সার্বক্ষণিক জিকির, তসবীহ, ইস্তেগফার, দোয়া, বিনয়– ইমান ও জ্ঞানের পরিচয়। যারা এই বৈশিষ্টাবলীমুক্ত, তারা চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কেননা চতুষ্পদ জন্তুরাও তাদের নিজস্ব নিয়মে জিকিররত থাকে।

সাধারণ তাফসীরকারকগণের অভিমত এই যে, সার্বক্ষণিক জিকিরের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। কেননা মানুষ সকল সময় দাঁড়ানো, বসা অথবা শোয়া অবস্থাতেই থাকে। রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের বাগানে পরিভ্রমণ করতে চায়, সে যেনো আল্লাহর জিকির অত্যধিক পরিমাণে করে। হাদিসটি হযরত মুয়াজ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা এবং তিবরানী।

জিকির এর পরে এখানে বলা হয়েছে ফিকির (চিন্তা) এর কথা। বলা বাহুল্য, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে সৃষ্টি মহান আল্লাহতায়ালার অপার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। তাঁর মহাপ্রজ্ঞা, মহাকৌশল এবং তাঁর অতুল এককত্বকে প্রমাণ করে। হজরত আলী (রা.) বলেছেন রসুল (সা.) এরশাদ করেছেন, তাফাককুরের মতো কোনো ইবাদত নেই।

হজরত আবু হোয়ায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, এক ব্যক্তি রাতে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলো। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো বিস্ময়ঘেরা নক্ষত্রমণ্ডলে। সে অভিভূত হলো এবং সাক্ষ্য দিলো, নিশ্চয়ই আমার প্রভুপালক সত্য। আমার স্রষ্টা সত্য। হে আমার মহান আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমাকে মার্জনা করো। মহান আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রহমত বর্ষণ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আবু শায়েখ, ইবনে হাব্বান, সা'লাবী।

হাদিস শরীফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) সব সময় জিকিররত থাকতেন। এই জিকির হুসুলি নয়। হুজুরীও নয়। মুখের জিকির তো নয়ই। সার্বক্ষণিক মৌখিক জিকির অসম্ভব। অথচ সার্বক্ষণিক জিকিরই আসল জিকির। এই জিকিরের স্তর অতি উচ্চ। তাফাককুর বা ফিকিরই কেবল ওই মূল জিকিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। এ কারণেই মহান আল্লাহ তায়ালা 'উলুল আলবাব' বা বোধশক্তি সম্পন্নদের বৈশিষ্টকে সার্বক্ষণিক জিকিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন এবং পরে উল্লেখ করেছেন চিন্তা-গবেষণার কথা। সঠিক চিন্তা-গবেষণা ওই জিকির পর্যন্ত পৌঁছুতে সহায়তা করে। ওই জিকির মূল প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ, যা অক্ষয়, অব্যয়। তাই দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে জিকির করার অর্থ সর্বক্ষণ জিকির করা।

এখানে ফিকিরের পূর্বে জিকিরের উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, কেবল

চিন্তা-গবেষণা বিশুদ্ধ নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সক্ষম নয়, যদি না সে জ্ঞান জিকিরের নূর এবং আল্লাহর পথপ্রদর্শন দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হয়। উল্লেখ্য ফিকিরের ভিত্তি জিকির এবং জিকিরের নূর। আল্লাহর জিকিরের নূর ব্যতিরেকে যারা চিন্তা-গবেষণায় লিপ্ত, তারা তাই পবিত্রতম সত্তা মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত। তারা প্রথিতযশা বিজ্ঞানী গবেষক, কিন্তু ঈমানদার নয়।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَّقُعُودً وَّعَلٰى جُنُوبِكُم فَإِذَا اطمَانَنتُم فَاَقِيمُوا

الصَّلٰوةَ انَّ الصَّلٰوةَ كَانَت عَلَى المُؤمِنِينَ كِتٰبًا مَّوقُوتًا.

উচ্চারণ ঃ ফাইযা-ক্বাদ্বাইতুমুস্বস্বালা-তা ফায্কুরূল্লা-হা ক্বিয়া-মাওঁ ওয়া ক্ব'উদাওঁ ওয়া 'আলা-জুনুবিকুম, ফাইযাত্ব মা'নানতুম্ ফাআক্বীমুস্বস্বালা-হ, ইন্নাস্ব্ স্বালা-তা কা-নাত্ 'আলাল মু'মিনীনা কিতা-বাম্ মাওকুতা।

(যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করিবে তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া মহান আল্লাহকে স্মরণ করিবে, নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য)। সুরা নিসা, আয়াত ১০৩।

ব্যাখ্যাঃ দণ্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায় মহান আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর স্মরণে রত থাকা। উম্মতজননী আম্মাজান হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) সবসময় আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতেন। (আবু দাউদ) উল্লেখ্য, কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে, বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখিত সার্বক্ষণিক জিকিরের উদ্দেশ্য কলবী জিকির। মুখে সর্বক্ষণ জিকির করা তো সম্ভবই নয়।

اُدعُوا رَبَّكُم تَضَرُّعًا وَّخُفيَةً ط انَّهُ لاَ يُحِبُّ المُعتَدِينَ ج

উচ্চারণঃ উদ্'উরাব্বাকুম তাদ্বার্রু 'আওঁ ওয়া খুফ্ইয়াহ ; ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুল মু'তাদীন।

(তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রভুপালককে ডাক; তিনি জালিমদিগকে পছন্দ করেন না)। সুরা আ'রাফ, আয়াত ৫৫।

ব্যাখ্যাঃ এখানকার 'খুফইয়াতান' শব্দটির অর্থ গোপন ইবাদত, যা বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে সম্পাদিত হয় এবং যা আত্মঅহমিকা থেকে মুক্ত। উল্লেখ্য, আত্মঅহমিকামুক্ত এবং মুদ্ধসংকল্প সম্বলিত না হলে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোনো ইবাদতই মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে গৃহীত হয় না।

হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার ধারণার অনুকূল। যদি সে

আমাকে গোপনে (মনে মনে) স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি গোপনে। যদি সে আমাকে দলবদ্ধভাবে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি পবিত্র ও মর্যাদাশালী দলের মধ্যে (ফেরেশতাদের সঙ্গে)। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার জিকির সিদ্ধ। কেউ কেউ বলেছেন, এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রকাশ্য ও সশব্দ জিকিরই উত্তম। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। বরং এখানে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নীরব ও সরব উভয় প্রকার জিকির গ্রহণীয়। বরং এখানে নীরব স্মরণকে সরব স্মরণাপেক্ষা প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। এক আয়াতে এসেছে–

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَا سِكَكُمْ فَاذْكُرُو الله كَذِكرِكُم اٰبَاءَكُم اوْ اَشَدَّ ذِكرًا ط فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ

رَبَّنَا اتِنَا فِى الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِى الاَخِرَةِ مِن خَلاَقٍ.

উচ্চারণ ঃ ফাইযা-ক্বাদ্বাইতুম মানা-সিকাকুম ফাযকুরুল্লাহা কাযি্করিকুম্ আ-বা-আকুম আওঁ আশাদ্দা যিক্‌রা ; ফামিনান না-সি মাইয়াকুলু রাব্বানা-আ-তিনা-ফিদ-দুন্‌ইয়া-ওয়ামা-লাহু ফিল আ-খিরাতি মিন্ খালা-ক্ব।

(অতঃপর যখন তোমরা হজের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন মহান আল্লাহকে এমন ভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা অধিক স্বরণ কর)। সুরা বাকারা, আয়াত ২০০। গোপন জিকিরই উত্তম । তবে কোনো কোনো উচ্চস্বরে জিকির অত্যাবশ্যক। যেমন– আজান, ইক্বামত, তাকবীর, তাশরীক ইত্যাদি। এছাড়া নামাজে ইমামের অজুভঙ্গ হলে তাঁকে উচ্চস্বরে তকবীর বলতে হয়। মোক্তাদির অজু ভঙ্গ হলে তাকে উচ্চস্বরে 'সুবহানাল্লাহ' বলে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। হজ্বের সময় উচ্চস্বরে বলতে হয় লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক....ইত্যাদি।

নিম্নস্বরের জিকির অথবা গোপন জিকিরই প্রকৃত জিকির। এ কথাটিও প্রণিধানীয় যে, সরবতা ও নীরবতার মধ্যে যেহেতু দৃশ্যত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, সেহেতু নীরবতাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হওয়াই সমীচীন। তাই গোপন জিকিরই (জিকরে খফি) উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের ঐকমত্য ছিলো নীরব জিকিরের পক্ষে।

মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন–

اُدعُوا رَبَّكُم تَضَرُّعًا وَّخُفيَة ط اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُعتَدِينَ.

উচ্চারণ ঃ উদ্‌'উ রাব্বাকুম তাদ্বাররু'আওঁ ওয়া খুফ্ইয়াহ ঃ ইন্নাহু লা-ইয়ুহিব্বুল মু'তাদীন।

(তোমরা বিনীতভাবে এবং গোপনে তোমাদের প্রভুপালককে ডাক)। সুরা আ'রাফ, আয়াত ৫৫। নবী জাকারিয়া সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ করেছেন–

اذ نَادَى رَبَّهٗ نِدَاءً خَفِيًّا

উচ্চারণ ঃ ইয্ না-দা-রাব্বাহু নিদা-আন্ খাফিয়্যা।

(যখন সে তাহার প্রভুপালককে আহ্বান করেছিল নিভৃতে)। সুরা মারইয়াম, আয়াত ৩।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, উত্তম জিকির হচ্ছে জিকরে খফি (নীরব জিকির) এবং উত্তম জীবিকা হচ্ছে ওই জীবিকা, যা ন্যূনতম সামর্থ্যের অন্তর্ভূত। আহমদ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী।

রসনা সঞ্চালনের মাধ্যমে অত্যন্ত অনুচ্চ আওয়াজে জিকির করা। রাসুলে আকরাম (সা.) বলেছেন, সকল সময় আল্লাহর জিকিরে তোমরা রসনাকে সিক্ত রাখো। ইমাম আহমদ ও তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল কোনটি? রাসুল (সা.) বললেন, পৃথিবী পরিত্যাগের সময় আল্লাহর জিকির দ্বারা রসনাকে সরব রাখা।

জিহ্বা সঞ্চালন ব্যতীত কেবল কলব, রূহ ও নফস দ্বারা গোপনে জিকির করা। এই জিকিরকে বলে জিকরে খফি। আমল লেখক ফেরেশতারা এই জিকির সম্পর্কে অজ্ঞাত।

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে আবু ইয়ালী বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, সরব জিকির অপেক্ষা নীরব জিকির সত্তর হাজার গুণ অধিক মর্যাদাপূর্ণ। শেষ বিচারের দিন ফেরেশতারা যখন মানুষের আমলনামা উপস্থিত করবে, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা এক লোককে দেখিয়ে বলবেন, ভালো করে দ্যাখো আমার এই বান্দার কোনো পাপ পুণ্য লেখা বাদ পড়লো কিনা! ফেরেশতারা বলবে, আমরা যা কিছু জেনেছি, শুনেছি ও দেখেছি– সবকিছুই আমলনামায় লিখে নিয়েছি। কোনো কিছুই পরিত্যাগ করিনি। মহান আল্লাহতায়ালা বলবেন, আমার এই বান্দার গোপন আমলও রয়েছে, যার কথা তোমরা জানো না। সেই আমল হচ্ছে জিকরে খফি।

আমি বলি, এই জিকরে খফি বা কলবী জিকিরের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হয় না। শারীরিক ক্লান্তি, শ্রান্তি ও আলস্য গোপন জিকিরের প্রতিবন্ধক নয়। জিকিরে জাগ্রত কলবে তাই প্রতিটি মুহূর্তে চলতে থাকে আল্লাহর জিকির।

وَاذكُر رَّبَّكَ فِى نَفسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الجَهرِ مِنَ القَولِ بِالغُدُوِّ وَالاصَالِ وَلَا تَكُن

مِّنَ الغٰفِلِينَ.

উচ্চারণ ঃ ওয়াযকুর্ রাব্বাকা ফী নাফ্সিকা তাদ্বাররু'আওঁ ওয়াখীফাতাওঁ ওয়া দুনাল্ জ্বাহ্রি মিনাল ক্বাওলি বিল গুদুওওয়ি ওয়াল্ আ-স্বা-লি ওয়ালা-তাকুম্ মিনাল গা-ফিলীন।

(তোমার প্রভুপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবে এবং তুমি উদাসীন হইবে না) সুরা আ'রাফ, আয়াত ২০৫।

ব্যাখ্যাঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এই আয়াতে নামাজের ক্বেরাতের উচ্চারণসীমা নির্দেশ করা হয়েছে। 'ওয়াজকুর রাব্বাকা ফি নাফসিকা' কথাটির মধ্যে উল্লেখিত 'জিকির' অর্থ নামাজের ক্বেরাত অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে নামাজের মধ্যে গোপনে, মনে মনে (জিহ্বা সঞ্চালনসহ) ক্বেরাত পাঠ করবে। 'ওয়া দুনাল জাহ্রি মিনাল ক্বওলি'– এখানে আল জাহরি অর্থ প্রকাশ্য নামাজ (যে নামাজে সশব্দে ক্বেরাত পাঠ করতে হয়)। দুনাল জাহরি অর্থ অনুচ্চস্বরে। অর্থাৎ সুউচ্চ স্বরের চেয়ে কম আওয়াজে এবং নিঃশব্দ আওয়াজের চেয়ে কিছুটা উচ্চস্বরে। এরকম বলার উদ্দেশ্য এই যে- যে নামাজগুলোতে উচ্চস্বরে ক্বেরাত পাঠের বিধান আছে (মাগরিব, এশা, ফজর) সে নামাজগুলোতে অত্যন্ত স্পষ্ট উচ্চারণে কোরআন পাঠ করো, অতিরিক্ত চিৎকার করো না। বরং এমন শান্তভাবে মধুর স্বরে পড়ো, যেনো পশ্চাতের ব্যক্তিদের শুনতে কোনো অসুবিধা না হয়।

মুজাহিদ বলেছেন, জিকির করবে অন্তরে অন্তরে। এটাই এই আয়াতের বক্তব্য। প্রার্থনার মধ্যে থাকতে হবে বিনয় ও শংকা। উচ্চকণ্ঠ হবে না। চিৎকার করে মহান আল্লাহকে ডাকবে না। মনে মনে দোয়া করলে হৃদয়ের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়।

আমি বলি, এখানে অনুচ্চস্বরে এবং মনে মনে কথা দুটোর মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সংযোগ। কথা দুটোর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে জিকরে জলী (অনুচ্চস্বরে জিকির) এবং জিকরে খফিকে (মনে মনে জিকিরকে)।

'বিল গুদুব্যি' অর্থ প্রত্যুষে, সকালে। আর 'ওয়াল আসরি' অর্থ দিবসের শেষভাগ, সন্ধ্যা। সকাল ও সন্ধ্যা এ দুটো সময় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এই দুই সময়ে বিশেষভাবে জিকিরে নিমগ্ন থাকতে বলা হয়েছে। নতুবা জিকির তো করতে হবে সর্বক্ষণ। তাই শেষে বলা হয়েছে 'ওয়ালা তাকুম মিনাল গাফিলীন' (এবং তুমি উদাসীন হয়ো না)। একথার অর্থ কোনো সময়ই আল্লাহর জিকির থেকে অমনোযোগী থেকো না।

আমি বলি, আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে 'ওয়াজকুর রব্বাকা ফি নাফসিকা'। পরে বলা হয়েছে, 'বিল গুদুব্যি ওয়াল আসলি ওয়ালা তাকুম মিনাল গফিলীন'। এই বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে এখানে জিকির বলে সব রকম জিকিরকেই বুঝানো

হয়েছে। কোরআন পাঠসহ সকল জিকিরই এই নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর স্মরণের বিষয়ে উদাসীনতা বা অমনোযোগিতা দূর করাই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য, যে কোনো ধরনের জিকিরের মাধ্যমে তা করা হোক না কেনো।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন- (সুরা আনফাল, আয়াত ২)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ ইন্নামাল মু'মিনূনাল্ লাযীনা ইযা-যুকিরাল্লা-হু ওয়াজ্বিলাত কূলূবুহুম ওয়া ইযা-তুলিয়াত আলাইহিম আ-ইয়া-তুহূ যা-দাত্হুম ঈমা-নাওঁ ওয়া 'আলা-রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালূন।

অর্থ: মু'মিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন মহান আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রভুপালকের উপরই নির্ভর করে।

ব্যাখ্যাঃ 'বিশ্বাসী তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহর স্মরণ করা হয়' এ কথার অর্থ– ওই সকল লোকই পরিপূর্ণ বিশ্বাসী, যাদের অন্তর (কলব) মহান আল্লাহতায়ালার অতুলনীয় মহিমা, গৌরব ও পরাক্রম স্মরণ করে ভীত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ওই সকল লোকের কথা বোঝানো হয়েছে, যারা কোনো পাপ কর্মের ইচ্ছা করলে তাদেরকে যদি বলা হয় 'মহান আল্লাহকে ভয় করো' তবে তারা আল্লাহর আযাবের ভয়ে তৎক্ষণাৎ সেই পাপকর্মের চিন্তা পরিত্যাগ করে। এই ব্যাখ্যার আলোকে এখানে 'আল্লাহর স্মরণ' অর্থ হবে– আল্লাহর আযাবের স্মরণ।

এরপর বলা হয়েছে– এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রভুপালকের উপরেই বিশ্বাস করে। একথার অর্থ– যখন ওই সকল ব্যক্তির সামনে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাদের প্রতি বর্ষিত হয় অজস্র বরকত। তাদের চোখে ও হৃদয়ে সমুদ্ভাসিত হতে থাকে মহান আল্লাহতায়ালার অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন। ফলে তাদের বিশ্বাস হয় অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ। তারা তখন সকল অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন কেবল আল্লাহর উপর। অন্যের উপর তারা যেমন নির্ভর করেন না, তেমনি অন্য কাউকে ভয়ও পান না। তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ সমর্পিত হয় আল্লাহর প্রতি।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ – الا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া তাত্বমাইননু কুলূবুহুম বিযিকরিল্লা-হি ; আলা-বিযিকরিল্লা-হি তাত্বমাইন্নূল কুলূব্।

অর্থঃ যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর স্মরণে যাহাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। সুরা রা'দ, আয়াত ২৮।

ব্যাখ্যাঃ 'যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়' একথার অর্থ– মহান আল্লাহ অভিমুখী যারা, তাদের চিত্তে (কলবে) বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয়। সকল সন্দেহের অবসান ঘটে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের হৃদয় হয় পরিতৃপ্ত। এখানে 'জিকির' অর্থ কোরআন মজিদ এবং 'ইতমিনান' অর্থ ঈমান। উল্লেখ্য, অপবিত্রতা ও অপবিশ্বাস হচ্ছে হৃদয়ের অস্বস্তি ও চাঞ্চল্য। আর হৃদয়ের প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি হচ্ছে ঈমান। অথবা আল্লাহর স্মরণে চিত্ত প্রশান্ত হয় কথাটির অর্থ হবে আল্লাহর জিকির দ্বারা হৃদয় থেকে দূরীভূত হয় শয়তানের প্ররোচণা। এমতাবস্থায় জিকিরের অর্থ হবে আল্লাহর স্মরণ।

রাসুল (সা.) বলেছেন, মানুষের অন্তঃকরণে (ক্বলবে) রয়েছে দুটি প্রকোষ্ঠ। একটিতে থাকে ফেরেশতা এবং অপরটিতে থাকে শয়তান। অন্তরে জিকির উত্থিত হলে শয়তান পালিয়ে যায়। আর জিকির না থাকলে শয়তান ক্বলবে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয় তার চিন্তা। এভাবেই সে মানুষকে প্ররোচিত করে। 'মুনসিফ' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে শায়বা এবং হযরত ইবনে আব্বাস থেকে মারফুরূপে প্রলম্বিত সূত্র সহযোগে বর্ণনা করেছেন বোখারী।

হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, শয়তান দলিত মথিত করতে থাকে মানুষের অন্তর। সে যখন জিকিরে রত হয়, তখন শয়তান পশ্চাদপসরণ করে, আর অমনোযোগী হলে অন্তরে ঢেলে দেয় কুমন্ত্রণা।

আলোচ্য বাক্যের মর্ম এরকমও হতে পারে যে, আল্লাহর জিকিরে চিত্ত প্রশান্ত হয়– যেমন সলিলাভ্যন্তরে লাভ করে মৎস্য, উন্মুক্ত আকাশে বিহঙ্গ এবং অরণ্যে অরণ্যবাসীরা। পক্ষান্তরে জিকির বিহীন অন্তরে সৃষ্টি হয় অশান্তি, যেমন অশান্তি ভোগ করে পানির সাথে সম্পর্কচ্যুত মাছ। পানিতে নিমজ্জিত স্থলচর প্রাণী এবং পিঞ্জিরায় আবদ্ধ পাখি। এই বিষয়টি সুফী সাধকগণের অনুসারীদের নিকটে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সত্যনিষ্ঠ পীর-মোর্শেদগণের খানকায় গমনকারীরা এর প্রত্যক্ষদর্শী। অতএব এখানে 'যারা বিশ্বাস করে' কথাটির মর্মার্থ হবে– ওই সকল সুফী দরবেশ, যাদের অন্তর পবিত্র ও জিকিরময়।

'জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়' কথাটির অর্থ– পবিত্র হৃদয় বিশিষ্ট যাঁরা, তাঁদের চিত্ত প্রশান্ত হয় আল্লাহর স্মরণে। এ সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার নিরসনের উল্লেখ করেছেন বাগবী। সন্দেহটি এরকম– এক আয়াতে

(সুরা আনফাল, আয়াত ২) বলা হয়েছে 'বিশ্বাসবান তারাই, আল্লাহর জিকির করা হলে যাদের হৃদয় আল্লাহর ভয়ে কম্পমান হয়'। আর এখানে বলা হলো 'আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়' এখন প্রশ্ন হলো ভয় ও প্রশান্তির সহঅবস্থান কি সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, শাস্তির বিষয় উল্লেখ করা হলে বিশ্বাসীদের অন্তরে জেগে ওঠে শংকা। আর আল্লাহর অপার করুণা ও ক্ষমার কথা মনে হলে অন্তরে আগমন করে প্রশান্তি। ভয় ও প্রশান্তি পরস্পরবিরোধী দুটো বিষয়। তাইএ দুটো একই সঙ্গে হৃদয়ে অবস্থান করতে পারে না। একটি এলে অপরটি অপসারিত হয়। আমি বলি, প্রশান্তি ও ভীতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈপরীত্য নেই। প্রশান্তি সৃষ্টি হয় 'উনস' বা অনুরাগ থেকে। আর অনুরাগ বর্তমান থাকে ভয়ের সময়েও। এভাবে একই সঙ্গে হৃদয়ে সহ্চারিত হতে থাকে ভয় ও আশা।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, অন্তিম যাত্রাকালে এক যুবকের শয্যাপাশে উপস্থিত হলেন রাসুল (সা.) বললেন, তোমার মনের অবস্থা এখন কেমন? যুবক বললো, আমি আল্লাহর ক্ষমার আশা রাখি আবার তাঁর ভয়ে আমি ভীতও। রাসুল (সাঃ) বললেন, পৃথিবী পরিত্যাগের প্রাক্কালে যার অন্তরের অবস্থা এরূপ হয়, মহান আল্লাহ তাকে দান করেন তার কাম্যবস্তু এবং রক্ষা করেন ভয়ভীতি থেকে। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

যখন তোমরা রাগান্বিত হও তখন মহান আল্লাহকে স্মরণ করো। ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, ইঞ্জিল শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, হে আদম সন্তান! তোমরা রাগান্বিত হলে আমাকে স্মরণ করো (তাহলে রাগ কমে যাবে)। এরকম যদি করো, তবে আমার রোষতপ্ত অবস্থায়ও আমি তোমাদের স্মরণ করবো (ক্ষমা করবো তোমাদের অপারগতাকে)।

জুহাক ও সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি নামাজের হুকুমের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে– নামাজের মধ্যে যদি তোমরা কোনো করণীয় আমলের কথা ভুলে যাও, তবে মহান আল্লাহকে স্মরণ কোরো। কথাটির অর্থ এরকমও নামাজ পাঠের কথা যদি তোমরা ভুলে যাও, তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে নামাজ আদায় করে নিও। হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রাসুল (সা.) আজ্ঞা করেছেন, যে ব্যক্তি নামাজ পড়তে ভুলে যায়, সে যেনো স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আদায় করে নেয়। বাগবী, বোখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিজি। নাসাঈর বর্ণনায় বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে– নিদ্রার কারণে যদি কারো নামাজ যথাসময়ে পঠিত না হয়, তবে তার কর্তব্য হবে, স্মরণ হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাদ পড়ে যাওয়া নামাজ আদায় করে নেবে।

সুফিয়ানে কেরাম আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এক সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে এই আয়াতের মর্মার্থ এরূপ– যখন তোমরা মহান আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কিছুর স্মরণে লিপ্ত হও, তখন আল্লাহর কথা স্মরণ করো বিশুদ্ধ অন্তরে। তাঁরা আরো বলেন, গাইরুল্লাহর স্মরণ থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশুদ্ধ হৃদয়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা যায় না। কারণ মানুষের ক্বলব একটিই। সুতরাং একথা কিছুতেই বলা যায় না যে, ক্বলবে একই সঙ্গে জাগ্রত থাকবে মহান আল্লাহ এবং গাইরুলল্লাহর (মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলকিছুর) স্মরণ। ক্বলবকে যদি আল্লাহর ভালোবাসায় পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করা যায় তাহলে নিশ্বাস-প্রশ্বাসও রঞ্জিত হবে আল্লাহর ভালোবাসায় ও স্মরণে। এই অবস্থার নাম ফানায়ে ক্বলব (ক্বলবের অস্তিত্ববিস্মৃতি)। এই ফানায়ে ক্বলব অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সুফিয়ানে কেরাম কাউকে তওহীদপন্থী বা এক আল্লাহর বিশ্বাস স্থাপনকারী মনে করেন না। আমি বলি, সুফিয়ানে কেরামের ব্যাখ্যাই কোরআন মজীদের স্পষ্ট বর্ণনা, আরবী ব্যাকরণ এবং অভিধানের অনুকূল। দেখুন, এখানে প্রথমে বলা হয়েছে 'যদি ভুলে যাও'। তারপর বলা হয়েছে 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো'। এভাবে এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, বিস্মরণ ও স্মরণ (গাফলত ও জিকির) বিপরীতধর্মী দুটি বিষয়। এ দুটোর একত্রায়ণ সম্ভবই নয়। সুতরাং এ দুটো ক্রিয়ার একটিকে প্রত্যক্ষ অর্থে, আর একটিকে পরোক্ষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে, যেনো কোনো অযথার্থ অর্থ গ্রহণ না করতে হয়। অতএব একথা মানতেই হবে যে, এক্ষেত্রে সুফিয়ানে কেরামের বক্তব্য সঠিক ও বাস্তবোচিত।

وَاصبِر نَفسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَوةِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجهَهُ ولا تَعدُ عَينٰكَ عَنهُمْ- تُرِيدُ زِينَةَ الحَيوٰةِ الدُّنيَا ولا تُطِع مَنْ اَغفَلنَا قَلبَهُ عَن ذِكرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمرُهُ فُرُطًا.

উচ্চারণ ঃ ওয়াছবির্ নাফসাকা মা'আল্লাযীনা ইয়াদ্ 'উনা রাব্বাহুম বিল্গাদা-তি ওয়াল 'আশিয়্যি ইউরীদূনা ওয়াজহাহূ ওয়ালা তা'দু আইনা-কা 'আনহুম, তুরীদু যীনাতাল হায়া-তিদ্ দুনইয়া, ওয়ালা তুত্বি' মান আগফালনা-ক্বালবাহু 'আন যিকরিনা- ওয়াত্তাবা'আ হাওয়া-হু ওয়া কা-না আমরুহু ফুরুত্বা।

অর্থঃ তুমি তাহার আনুগত্য করিও না– যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে। সুরা কাহফ। আয়াত ২৮।

ব্যাখ্যাঃ বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যে দেওয়া হয়েছে উয়াইনার বিবরণ।

বলা হয়েছে– হে আমার রাসুল! আমি উয়াইনার ক্বলবকে আমার জিকির থেকে বঞ্চিত করেছি। সে তার প্রবৃত্তিজাত খেয়ালের অনুসারী এবং তার কার্যকলাপ সীমালংঘনের দায়ে দুষ্ট। অতএব তার কথায় আকৃষ্ট হবেন না। কিন্তু ইবনে মারদুবিয়া ও জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য বাক্যে বলা হয়েছে উমাইয়া বিন খালফ্ জামুহীর কথা। সে একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলেছিলো, মোহাম্মদ! তোমার দরিদ্র সহচরদের দূর করে দিয়ে তদস্থলে মক্কার নেতৃবৃন্দকে তোমার কাছে বসতে দাও। বলা বাহুল্য, তার এরকম গর্হিত বক্তব্য মহান আল্লাহ পছন্দ করেননি। সে কথাই জানিয়ে দিয়েছেন এই আয়াতে।

ইবনে বুরাইদার বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসুলুল্লাহর মহান সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন হজরত সালমান ফারসী (রা.)। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো উয়াইনা। বললো, আমরা অভিজাত শ্রেণির লোকেরা আপনার কাছে বসতে চাই। তাই বলি, ওই অনভিজাতদেরকে তাড়িয়ে দিন। তখন অবতীর্ণ হলো 'যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি'। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, অভিজাত নেতৃবৃন্দের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে বলা হয়েছে দু'টি কারণে–

১. তাদের কলবে আল্লাহর জিকির নেই।

২. তারা অনুসরণ করে তাদের নফসের খেয়ালখুশীকে।

উল্লেখ্য, পার্থিব প্রতাপ এবং বংশমর্যাদার অহংকার দূর না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নৈকট্য লাভ করা যায় না। সুতরাং যাদের কলব আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল এবং যারা নফসের অনুসারী তাদের অনুসরণ নিষিদ্ধ। (তারা আলেম, ফাজেল, নেতা, মন্ত্রী যেই হোক না কেনো)।

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ص يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ

উচ্চারণ ঃ রিজ্বা-লুল, লা-তুলহীহিম্ তিজ্বা-রাতওঁ ওয়ালা-বাই'উন আন্ যিকরিল্লা-হি ওয়া ইক্বা-মিস্ব্ স্বালা-তি ওয়া ঈতা-য়িয্যাকা-তি, ইয়াখা-ফুনা ইয়াওমান তাতাক্বাল্লাবু ফীহিল কুলূবু ওয়াল্ আবস্বা-র।

অর্থঃ সেই সব লোক, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে। সুরা নূর, আয়াত ৩৭।

ব্যাখ্যাঃ ‘জিকরিল্লাহ’ (আল্লাহর স্মরণ) অর্থ এখানে নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন। সালেম সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, একবার আমি ছিলাম বাজারে। এমন সময় নামাজের ইকামত শুরু হলো। বাজারের লোকজন দোকানপাট বন্ধ করে শামিল হলো নামাজের জামাতে। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

অথবা এখানে ‘জিকরিল্লাহ’ অর্থ আল্লাহর সার্বক্ষণিক জিকির। এভাবে ‘জিকির’ শব্দটি হবে ব্যাপক অর্থবোধক। যাঁরা সারাক্ষণ আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন, তাঁরা সকলেই হবেন এর অন্তর্ভুক্ত। অন্তর্ভুক্ত হবেন তারাও, যাঁরা জাগতিক কাজকর্ম পরিহার করেন না বটে, কিন্তু যাঁদের অন্তর থাকে সতত স্মরণমুখর। ব্যবসা-বাণিজ্য ও পার্থিব দায়িত্ব যাঁদের অন্তরকে আল্লাহর স্মরণচ্যুত করতে পারে না। অর্থাৎ তাঁদের বাহির পৃথিবীর প্রয়োজনসমূহের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু অন্তর সংযুক্ত আল্লাহর জিকিরের সঙ্গে।

উল্লেখ্য, এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেই ইমামুত তরিকত হযরত বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দি (র.) বলেছেন, এই তরিকার (নক্‌শবন্দিয়া) বিশেষত্ব এই যে, একই সঙ্গে মানুষের ‘জাহের’ দুনিয়ার সঙ্গে এবং ‘বাতেন’ মহান আল্লাহতায়ালার স্মরণে মশগুল থাকে।

اُتلُ مَااُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةِ ط اِنَّ الصَّلٰوة تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ ط

وَلَذِكرُ اللهِ اَكْبَرُ ط وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ উত্‌লু-মা ঊহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতা-বি ওয়া আক্বিমিস্ব্‌ স্বালা-তা ; ইন্নাস্ব স্বালা-তা তান্‌হা- ‘আনিল ফাহ্‌শা-ই ওয়াল মুনকারি ; ওয়া লাযিকরুল্লা-হি আকবারু; ওয়াল্লা-হু ইয়া’লামু মা-তাসনা‘ঊন।

অর্থ: তুমি আবৃত্তি কর কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হইতে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাহা কর মহান আল্লাহ তাহা জানেন। সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫।

ব্যাখ্যাঃ ‘আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ’ কথাটির গুরুত্ব অপরিসীম। এরকম মন্তব্য করেছেন ইবনে আতা। কোনো পাপই জিকিরের সামনে টিকতে পারে না। আর এখানে ‘জিকরিল্লাহ’ অর্থ ওই নামাজ, যা পাপপ্রতিরোধক। নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। তাই এখানে নামাজকেই সরাসরি বলা হয়েছে ‘জিকরুল্লাহ’।

জিকিরের মাহাত্ম্যঃ জিকিরের মহিমা-মাহাত্ম্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে অনেক

হাদিস। তন্মধ্যে কিছুসংখ্যকের উল্লেখ করা হলো এখানে এভাবে−

হজরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার রাসুল (সা.) উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা জানাবো না, যা তোমাদের কর্তা-বিধাতার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, পবিত্র ও সর্বোত্তম। যা আল্লাহর পথে স্বর্ণ-রৌপ্য দান করা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ? এমনকি অধিক পুণ্যার্জক রণক্ষেত্রে শত্রু নিধনের চেয়েও? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! অবশ্যই দয়া করে বলুন। রাসুল (সা.) বললেন, তা হলো আল্লাহর জিকির। আহমদ, মালেক, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রাসুলে করীম (সা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর প্রিয়তম বাণীবাহক! আল্লাহর দাসগণের মধ্যে তাঁর নিকট কে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন? রাসুল (সা.) বললেন, যে মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ধর্মযোদ্ধার চেয়েও কি? রাসুল (সা.) বললেন, হ্যাঁ, যদিও সেই ধর্মযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে তার তরবারী ভেঙে ফেলে এবং রক্তাক্ত হয়। আহমদ, তিরমিজি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বিশর (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি একবার রাসুলে আকরম (সা.) সকাশে হাজির হয়ে বললো, হে দয়াল নবী! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান? রাসুল (সা.) বললেন, যার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ ও পুণ্যকর্মশোভিত। লোকটি জানতে চাইলো, সর্বাধিক নন্দিত কর্ম কোনটি? রাসুল (সা.) বললেন, ওই জিকির, যা অন্তিমযাত্রার প্রাক্কালে সিক্ত করে রাখে রসনা। আহমদ, তিরমিজি।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সা.) একবার মক্কার জুমদান পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। অতঃপর রাসুল (সা.) পাহাড়ের উপর দিয়ে অগ্রসর হলেন। চলতে চলতে সহচরবৃন্দকে বললেন, তোমরা আরও অগ্রসর হও। শোন, এই পাহাড়ের নাম জুমদান। 'তাফরীদকারীরা' তো অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে। সহচরবৃন্দ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! 'তাফরীদকারী' কারা? রাসুল (সা.) বললেন, অত্যধিক জিকিরকারী নারী-পুরুষ। মুসলিম।

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, যারা জিকির করে এবং যারা জিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত। বোখারী, মুসলিম।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলে আকরম (সা.) বলেছেন, আল্লাহর এক দল ফেরেস্তা আছে, যারা জিকিরকারীদের সমাবেশ সন্ধান করে

ফেরে। কোথাও জিকিরের সমাবেশ দেখতে পেলে একজন আর একজনকে ডেকে বলে, এসো এসো এই যে এখানে। তখন সকলে সেখানে সমবেত হয়। ঘিরে ফেলে জিকিরের মজলিশ। একজনের উপরে একজন– এরকম করতে করতে ফেরেস্তাবৃন্দ পৌঁছে যায় আকাশের কাছাকাছি। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করেন, আমার দাসেরা কী বলে? ফেরেস্তারা জবাব দেয়, বর্ণনা করে তোমার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা। মহান আল্লাহ বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেস্তারা বলে, না। মহান আল্লাহ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেস্তারা বলে, তবে তো তাদের জিকির ও ইবাদতে প্রকাশ পেতো আরো বেশী আবেগ, উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস। তোমার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা প্রকাশ করতো আরো অধিক উৎসাহভরে। মহান আল্লাহ প্রশ্ন করে, তারা কী চায়? ফেরেস্তারা বলে, জান্নাত। মহান আল্লাহ বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেস্তারা জবাব দেয়, না। মহান আল্লাহ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেস্তারা বলে, তাহলে তো তাদের জান্নাতলাভের কামনা হতো আরো অধিক প্রবল। মহান আল্লাহ পুনরায় প্রশ্ন করেন, তারা পরিত্রাণ চায় কোন বস্তু থেকে? ফেরেস্তারা বলে, জাহান্নাম থেকে? মহান আল্লাহ বলেন, তারা কি কখনো জাহান্নাম দেখেছে? ফেরেস্তারা জবাব দেয়, না। মহান আল্লাহ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেস্তারা বলে, তাহলে তো তারা হয়ে যেতো আরো বেশী ভীত। মহান আল্লাহ তখন বলেন, হে ফেরেস্তামণ্ডলী! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। জনৈক ফেরেস্তা বলে, হে প্রভুপালক! তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তিও ছিলো। সে মহাপাপী। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেখানে সে উপস্থিত হয়েছিলো এবং জিকিরের মজলিসে বসে পড়েছিলো। জিকিরের উদ্দেশ্য তার ছিলোই না। মহান আল্লাহ তায়ালা জবাব দেন, আমি তাকেও মাফ করে দিলাম। কারণ তারা (জিকিরকারীরা) এমন একটি দল, যাদের সঙ্গে উপবেশনকারীকেও বঞ্চিত করা হয় না। বোখারী। মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনার শেষাংশটি এরকম– জনৈক ফেরেস্তা তখন বলে, হে আমাদের প্রভু পালনকর্তা! একজন পথিক ভুলক্রমে সেখানে বসে পড়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তাকেও মার্জনা করলাম। জিকিরকারীদের দলভুক্তরা সৌভাগ্যবঞ্চিত হয় না। হযরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আজ্ঞা করেছেন, স্বর্গোদ্যানের পাশ দিয়ে গমন করার সুযোগ পেলে স্বর্গস্বাদ গ্রহণ না করে চলে যেয়ো না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! স্বর্গোদ্যান আবার কী? রাসুল (সা.) বললেন, জিকিরের অধিবেশন।

ইমাম মালেক বলেছেন, আমার নিকটে এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জিকিরমগ্ন ও জিকিরবিচ্যুতদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যথাক্রমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় যোদ্ধা এবং ধর্মযুদ্ধ থেকে পলাতক কাপুরুষ।

রযীন বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে জিকিরকারী যেনো বিরসবৃক্ষকাণ্ডে পল্লবিত শাখা। যেনো অন্ধকার গৃহমধ্যে প্রদীপের আলো। যারা অমনোযোগীদের মধ্যে আল্লাহর স্মরণে রত, মৃত্যুর পূর্বে মহান আল্লাহ দেখিয়ে দেন তাদেরকে তাদের জান্নাতের ঠিকানা। তাদের পাপ মানব-দানব-প্রাণী-পাখির সমতুল্য হলেও মহান আল্লাহ তা মাফ করে দেন।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবালের বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর শাস্তি থেকে নিষ্কৃতিপ্রদায়ক একমাত্র আমল হচ্ছে জিকির। মালেক, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হযরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, ফেরেস্তারা জিকিরের মাহফিলকে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখে। আল্লাহর করুণার বিরতিহীন বর্ষণ হয় ওই মাহফিলের উপর। অবতীর্ণ হয় সাকিনা (আত্মিক প্রশান্তি)। আর মহান আল্লাহ জিকিরকারীদের আলোচনা করেন তাঁর নৈকট্যভাজন ফেরেস্তাদের সঙ্গে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, তার কাছে আমি তেমনই। আর আমাকে যখন সে স্মরণ করে, তখন আমি হই তার অঙ্গ। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি সঙ্গোপনে। আর যদি সে আমাকে স্মরণ করে দলবদ্ধ হয়ে, তখন আমিও তাকে স্মরণ করি ফেরেস্তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে। বোখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ' কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে– তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। মানুষ মুখাপেক্ষী। সুতরাং অন্যের জিকির করা তাঁর কর্তব্য, প্রয়োজন কোনোটাই নয়। অথচ তিনি দয়া করে জিকিরকারীদের জিকির করেন। সুতরাং বুঝতে হবে আল্লাহর জিকির করার বিষয়টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এরকম তাফসীর বর্ণিত হয়েছে মুজাহিদ, ইকরামা এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে। আরেক বর্ণনা অনুসারে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাও এরকম।

বাগবী লিখেছেন, নাফেয়ের মধ্যস্থতায় মুসা ইবনে উকবার বিবরণে এসেছে,

হযরত ওমরও সর্বোন্নত সূত্রে রাসুল (সা.) থেকে সরাসরি এরকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম– তোমরা আল্লাহর জিকির করতে কার্পণ্য করো না। কারণ জিকিরকারী মহান আল্লাহতায়ালার অতুলনীয় স্মরণভূত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। মনে রেখো, তোমাদের স্মরণের তুলনায় আল্লাহর স্মরণ অনেক অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ, মহিমান্বিত ও গৌরবের।

لَقد كَانَ لكُم فِى رَسُول اللهِ اُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرجُوا اللهَ وَاليَومَ الاخِرَ وَذْكَرَ اللهَ كَثِيرًا.

উচ্চারণ ঃ লাক্বাদ কা-না লাকুম ফী রাসূলিল্লা-হি উস্‌ওয়াতুন হাসানাতুল লিমান্ কা-না ইয়ারজুল্লা-হা ওয়াল্ ইয়াওমাল আ-খিরা ওয়া যাকারাল্লা-হা কাছীরা।

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যাহারা মহান আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাহাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ। সুরা আহযাব, আয়াত ২১।

ব্যাখ্যাঃ 'তোমাদের মধ্যে যারা মহান আল্লাহ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে' অর্থ আল্লাহর নিকট থেকে যারা আকাঙ্ক্ষী হয় পুন্যের, পুন্যময় দীদারের, অর্থাৎ পারলৌকিক সফলতার। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)। এখানে মহান আল্লাহকে ভয় করার অর্থ আল্লাহর অনুগ্রহের আশা করা ও শাস্তির ভয় করা। বিশেষ করে, আশা করা পরকালের পুরস্কারের এবং ভয় করা তিরস্কারের। যেমন আরববাসীগণ বলেন, 'আরজু যায়দান ও ফাদ্বলাহু' (আমি যায়েদের করুণাকামী)। মুকাতিল বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ যারা শংকিত থাকে মহাবিচারদিবসের ভয়ে। আর 'মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে' অর্থ মহান আল্লাহকে স্মরণ করে সুখে দুঃখে সবসময়। উল্লেখ্য, অধিক স্মরণই হয় অব্যাহত আনুগত্যের কারণ। সে জন্যই এখানে মহান আল্লাহকে ভয় করার সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে তাঁকে অধিক স্মরণ করার কথা। অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁকে অধিক স্মরণ করে, তাঁরাই হয় তাঁর রাসুলের একান্ত অনুগামী।

اِنَّ المُسلِمِينَ والمُسلِمتِ وَالمُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنتِ وَالقنِتِينَ وَالقنِتتِ وَالصّدِقِينَ وَالصّدِقتِ
وَالصّبِرِينَ وَالصّبِرَاتِ وَالخَشِعِينَ وَالخَشِعَتِ وَالمُتَصَدِّقِينَ وَالمُتَصَدِّقتِ وَالصّائِمِينْ
وَالصّئِمَتِ وَالحَفِظِينَ فُرُوجَهُم وَالحَفِظَتِ وَالذّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَّالذّاكِراتِ- اَعَدَّ اللهُ لَهُم
مَّغفِرَةً وَّاجرًا عَظِيمًا

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল মুসলিমীনা ওয়াল্ মুসলিমা-তি ওয়াল্ মু'মিনীনা ওয়াল্

মু'মিনা-তি ওয়াল্ ক্বা-নিতীনা ওয়াল্ ক্বা-নিতা-তি ওয়াস্ব স্বা-দিক্বীনা ওয়াস্ব স্বা-দিক্বা-তি ওয়াস্ব স্বা-বিরীনা ওয়াস্ব স্বা-বিরা-তি ওয়াল খা-শিঈনা ওয়াল খা-শিআ-তি ওয়াল্ মুতাসাদ্দিক্বীনা ওয়াল্ মুতাসাদ্দিক্বা-তি ওয়াস্ব স্বা-ইমীনা ওয়াস্ব স্বা-ইমা-তি ওয়াল্ হা-ফিজীনা ফুরুজ্বাহুম ওয়াল্ হা-ফিজা-তি ওয়ায্ যা-কিরীনাল্লা-হা কাছীরাওঁ ওয়ায্ যা-কিরা-তি, আ'আদ্দাল্লা-হু লাহুম মাগফিরাতাওঁ ওয়াআজ্বরান 'আজীমা।

অর্থ: অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ এবং যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী নারী, মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী– ইহাদের জন্য মহান আল্লাহ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। সুরা আহযাব, আয়াত ৩৫।

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ্তায়ালা যাঁদেরকে তাঁর ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন, এখানে তাঁদের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষে উল্লেখ করা হয়েছে মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ এবং অধিক স্মরণকারী নারীদের কথা।

হযরত মুয়াজ (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রাসুলে করীম (সা.) এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে রসুলগণের মুকুটমণি! সর্বাধিক পুণ্যের অধিকারী কোন মুজাহিদ? রাসুল (সা.) বললেন, যে মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলো, সর্বাধিক পুন্যবান রোজাদার কে? রাসুল (সা.) বললেন, যে আল্লাহর সর্বাধিক জিকিরকারী। এভাবে সে একে একে প্রশ্ন করলো সর্বাধিক পুন্যবান নামাজ, হজ্ব, জাকাত ও দান খয়রাতকারী সম্পর্কে। রাসূল (সা.) তার প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে বললেন, যে মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। এরকম প্রশ্নোত্তর শুনে হযরত আবু বকর হযরত ওমরকে বললেন, সর্বাধিক জিকিরকারীরাই যে অধিকারী হলো সর্বাধিক পুন্যের। রাসুল (সা.) বললেন, অবশ্যই।

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, যে ব্যক্তি মোটেও আল্লাহর স্মরণবিচ্যুত হয় না, বরং দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে– সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জিকিরকারী। আমি বলি, ক্বলবের ফানা না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত জিকিরকারী হওয়া যায় না। যখন ক্বলব আল্লাহর জিকিরে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়, তখনই কেবল হৃদয়ে জাগ্রত থাকে আল্লাহর সতত স্মরণ।

রাসুল (সা.) বলেছেন, ইফরাদকারীরাই অগ্রগামী। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! ইফরাদকারী কারা? রাসুল (সা.) বললেন, মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী ও পুরুষ। রাসুল (সা.) আরো বললেন, আল্লাহর অধিক স্মরণকারী নারী ও পুরুষ। রাসুল (সা.) আরো বললেন, আল্লাহর আযাব থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে কেবল আল্লাহর জিকির। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহর পথে জেহাদও কি আল্লাহর জিকিরের সমতুল্য নয়? রাসুল (সা.) বললেন, না। জেহাদও জিকিরের তুল্য নয়। যুদ্ধ করতে করতে কোনো মুজাহিদ যদি তার তলোয়ার ভেঙেও ফেলে তথাপিও জেহাদের তুলনায় জিকিরের মর্যাদা হবে অধিক। বায়হাকী তাঁর দাওয়াতুল কবীর গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার রাসুল (সা.) সকাশে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! মহাবিচারের দিবসে মহান আল্লাহ সকাশে কে হবে অন্যাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান? রাসুল (সা.) বললেন, অধিক জিকিরকারী রমণী ও পুরুষ। পুনঃ নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর বাণীবাহক! আল্লাহর পথে যারা যুদ্ধ করে, তাদের চেয়েও কি? রাসুল (সা.) বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে যোদ্ধা আল্লাহর দুশমন নিধন করতে গিয়ে ভেঙে ফেলে তার তরবারী। আহম, তিরমিজি।

ইমাম মালেক বলেছেন, আমার নিকট পৌঁছেছে এই হাদিসটি– রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর স্মরণবিচ্যুতদের মধ্যে জিকিরকারীর অবস্থান এরকম– যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়নপর যোদ্ধাদের মধ্যে স্বস্থানে অটল কোনো মুজাহিদ, যেনো বিশুষ্ক বৃক্ষের একটি সতেজ শাখা, যেনো অন্ধকার গৃহমধ্যে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ। জিকিরবিস্মৃতদের মধ্যে অবস্থানকারী জিকিরকারীকে দেখানো হয় তার জান্নাতের আবাস। মহান আল্লাহ তাদেরকে মার্জনা করেন পৃথিবীর সবাক ও নির্বাক প্রাণীকুলের সমতুল্য পাপকর্ম করলেও। ইবনে রযীন।

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اذكُرُوا اللهَ ذِكرًا كَثِيرًا وَّسَبِّحُوهُ بُكرَةً وَّ اصِيلاً

উচ্চারণ ঃ ইয়া-আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুয কুরুল্লা-হা যিক্‌রান্‌ কাছীরা। ওয়া সাব্বিহূহু বুকরাতাওঁ ওয়া আস্বীলা।

(হে মুমিনগণ! তোমরা মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো)। সুরা আহযাব, আয়াত ৪১, ৪২।

ব্যাখ্যাঃ এখানেও ' মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো' অর্থ তোমরা প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করো আল্লাহর জিকিরের সঙ্গে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মহান আল্লাহতায়ালা প্রতিটি পুন্যকর্মের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু জিকিরের জন্য কোনে সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেননি। অক্ষমতার ক্ষেত্রে অবশ্য বিধানটি শিথিল হলেও হতে পারে। কিন্তু জিকিরের কোনো সীমানা আসলে নেই। নেই কোনো অজুহাতও। বিষয়টি শিথিল কেবল পাগলদের ক্ষেত্রে। অন্য সকলের ক্ষেত্রে বিধানটি অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই জিকির পরিত্যাগ করা যাবে না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যারা জিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে....'। এখানেও তেমনি বলা হয়েছে– তোমরা মহান আল্লাহকে স্মরণ করো অধিক পরিমাণে। অর্থাৎ জিকির করো নিশিথে-দিবসে-জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সুস্থ-অসুস্থ প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থায়।

মুজাহিদ বলেছেন, অধিক পরিমাণে জিকির করার মর্মার্থ হচ্ছে– আল্লাহর কথা কখনোই বিস্মৃত হওয়া যাবে না। আমি বলি, এরকম অবস্থা লাভ হতে পারবে কেবল তখন, যখন লাভ হবে ফানায়ে কলব। এমতাবস্থায় অন্তর্জগতে সতত জাগ্রত থাকে আল্লাহর জিকির।

اَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدرَهُ لِلاِسلاَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ط فَوَيلٌ لِلقَسِيَةِ قُلُوبُهم مِّن ذِكرِ

الله– اولَئكَ فِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ.

উচ্চারণ ঃ আফামান শারাহাল্লা-হু স্বাদ্‌রাহূ লিল্‌ইসলা-মি ফাহুওয়া 'আলা-নূরিম মির্‌ রাব্বিহী ; ফাওয়াইলুল লিল্‌ ক্বা-সিয়াতি কুলূবুহুম্‌ মিন্‌ যিকরিল্লা-হি ; উলা-ইকা ফী দ্বালা-লিম্‌ মুবীন।

অর্থ: মহান আল্লাহ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন এবং যে তাহার প্রভুপালক প্রদত্ত আলোতে রহিয়াছে, সে কি তাহার সমান, যে এরূপ নহে? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যাহারা আল্লাহর স্মরণে বিমুখ! উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। সুরা যুমার, আয়াত ২২।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতখানির মর্মার্থ এরকম– মহান আল্লাহ ইসলাম গ্রহণের জন্য যার বক্ষকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার ফলে যে তার প্রভুপালক কর্তৃক প্রদত্ত জ্যোতি দ্বারা সমাবৃত রয়েছে, সে কি ওই লোকের সমতুল, যার বক্ষপ্রকোষ্ঠ রুদ্ধ? যার অন্তর আল্লাহর স্মরণমগ্ন নয়। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন দুর্ভোগ। সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট।

'শারাহাল্লাহু সদরাহু' অর্থ মহান আল্লাহ যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। 'নূরিমমির রব্বিহী' অর্থ প্রভুপালক প্রদত্ত নূর। জ্যোতি বা আলো। উল্লেখ্য, এই

আলোই সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ প্রদর্শক। এই আলো যে পায়, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি তার বিশ্বাস হয়ে যায় চিরঅক্ষয়। আর এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান বা বিশ্বাসকে ধারণ করে কলব বা অন্তর। মস্তিষ্ক বা অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঈমানকে ধারণ করে না। মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত এই আলোর অধিকারীদেরকেই বলা যেতে পারে আলোকিত মানুষ। তাঁদেরই হৃদয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে ইসলামের নির্দেশাবলী। হয়ে যায় অপরিমেয়রূপে প্রশস্ত, যেমন কোনো আধার তার আধেয়কে ধারণ করে প্রসারিত হয় প্রয়োজনানুসারে বিনা প্রয়াসে। আর এখানকার নূর শব্দটির প্রকৃত অর্থ দিব্যদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য উপস্থাপনা করা হয়েছে জিজ্ঞাসার আকারে। তাই প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে 'আফামান' এবং এর প্রবণতা রয়েছে 'ফা' সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর দিকে। এমতাবস্থায় বক্তব্যরূপটি হয়েছে এরকম– বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে যখন পার্থক্য প্রমাণিত হলো, তখন হে আমার নবী! তাদের অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের বিষয়টিও শুনে রাখুন– প্রকৃত বিশ্বাসীদের অন্তরসমূহকে মহান আল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। ফলে তারা বক্ষে ধারণ করে এক বিশেষ নূর, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। হয়ে যায় প্রকৃত অর্থে মু'মিন ও সত্যাধিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্ যাদের অবরুদ্ধ বক্ষকে উন্মুক্ত করেননি, তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন চিরভ্রষ্টতার মোহর, সত্য প্রত্যাখ্যান তাদের জন্য স্বাভাবিক। তাদের ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। এখন আপনিই বলুন, বিশ্বাসী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী কি তাহলে সমান?

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার রাসুল (সা.) এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর বাণীবাহক! বক্ষ উন্মুক্ত হয় কীভাবে? রাসুল (সা.) বললেন, অন্তরে প্রবেশ করে এক বিশেষ নূর, ফলে কলব হয়ে যায় সুউন্মুক্ত ও সুবিস্তৃত। আমরা বললাম, এর বাহ্যিক লক্ষণ কী? রাসুল (সা.) বললেন, পরকালের দিকে সর্বোতভাবে ঝুঁকে পড়া, প্রতারণা ও অহমিকাপূর্ণ পৃথিবী থেকে দূরে অবস্থান করা, মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করা। বাগবী, হাকেম, বায়হাকী।

'ফা ওয়াইলুল লিলক্বসিয়াতি ক্বুলুবুহুম মিন জিকরিল্লাহ' অর্থ দুর্ভোগ ওই কঠোরহৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহর স্মরণে পরাঙ্মুখ। এখানে 'ফাওয়াইলুল' এর 'ফা' কারণপ্রকাশক। আর 'মিন জিকরিল্লাহ'র 'মিন' সময়নির্দেশক। অর্থাৎ যখন তাদের সম্মুখে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, অথবা পাঠ করা হয়

আল্লাহর বাণী, তখন তাদের কলব হয়ে যায় আরো কঠোর। এভাবে দেখা যায় আল্লাহর জিকিরই তাদের কলব কঠুর, কঠুরতর হওয়ার কারণ।

আল্লাহর জিকির ইমানদার ও কাফেরের অন্তরে সৃষ্টি করে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। আর এরকম হয় তাদের সম্প্রসারিত ও সংকুচিত বক্ষের কারণেই।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাদাতা বলেছেন– এখানে 'জিকরিল্লাহ' কথাটির পূর্বে 'তারকা' (পরিত্যাগ) শব্দটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে– ওই সকল লোকের জন্য রয়েছে অতীব দুর্ভোগ, যাদের কলব আল্লাহর জিকির পরিত্যাগ করার কারণে কঠিন হয়ে গিয়েছে। মালেক ইবনে দীনার বলেছেন, হৃদয়ে কাঠিন্য অপেক্ষা অধিক কোনো শাস্তি বান্দার জন্য নির্ধারণ করা হয়নি। আর কোনো জাতির প্রতি তখনই আল্লাহর গজব পড়ে, যখন তাদের হৃদয় থেকে বের হয়ে যায় মমতা-কোমলতা।

وَمَن يَعشُ عَن ذِكرِ الرَّحمَٰنِ نُقَيِّض لَهُ شَيطَٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ – وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ

السَّبِيلِ وَيَحسَبُونَ انَّهُم مُّهتَدُونَ.

উচ্চারণ ঃ ওয়া-মাই ই'য়াশু আন্ যিক্‌রির রাহমা-নি নুক্বায়্যিদ্ব লাহূ শাইত্বা-নান ফাহুয়া লাহূ ক্বারীন। ওয়া ইন্নাহুম লাইয়াস্বুদ্দুনাহুম্ 'আনিস্ সাবীলি ওয়া ইয়াহসাবূনা আন্নাহুম মূহ্‌তাদূন।

অর্থ: যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তাহার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে। সুরা যুখরুফ, আয়াত ৩৬, ৩৭।

ব্যাখ্যাঃ উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে– যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে আকাশজ বাণী সম্ভার এই কোরআনের প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন করে, মগ্ন থাকে ঘোর পার্থিবতায়, ফলে হয়ে পড়ে আল্লাহর স্মরণচ্যুত, আমি তার সহচররূপে নিযুক্ত করি এক শয়তান। ওই শয়তান তখন তাকে শুভপথানুসারী হতে দেয়ই না। ভ্রষ্টতাকে তার দৃষ্টিতে করে তোলে শোভন। সেকারণেই ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও সে তখন মনে করে, তার পথই সঠিক পথ।

এখানে 'নুক্বাইয়্যিদ লাহু শাইত্বানা' অর্থ নিয়োজিত করি শয়তান। 'ফাহুয়া লাহু ক্বরীন' অর্থ সেই হয় তার সহচর। উল্লেখ্য, তার ওই শয়তান সহচরটিই তখন মহান আল্লাহবিমুখ ব্যক্তিকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আর

অপবিশ্বাস ও পাপকে তার চোখে প্রতিভাত করায় সুন্দররূপে। আর সে-ও তখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, তার খারাপ চরিত্র মতাদর্শই সৎমতাদর্শ।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلاً.

উচ্চারণ ঃ ওয়াযকুরিস্‌মা রাব্বিকা ওয়া তাবাত্তাল ইলাইহি তাবতীলা।

অর্থ: সুতরাং তুমি তোমার প্রভুপালকের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও। সুরা মুয্‌যাম্মিল, আয়াত ৮।

ব্যাখ্যাঃ 'ওয়াজকুরিসমা রব্বিকা ওয়া তাবাততাল ইলাইহি তাবতিলা' অর্থ সুতরাং তুমি তোমার প্রভুপালনকর্তার নাম স্মরণ করো এবং কেবল তাঁতেই মগ্ন হও।

এখানে 'প্রভুপালকের নাম স্মরণ করো' অর্থ সর্বক্ষণ আল্লাহর জিকির করো। কোনো মুহূর্তের জন্য আল্লাহর জিকির থেকে অমনোযোগী থেকো না। বাক্যটির বক্তব্যগত যোগ রয়েছে ২ সংখ্যক আয়াতের 'রাত্রি জাগরণ করো' কথাটির সঙ্গে। উল্লেখ্য, সার্বক্ষণিক জিকির মুখের দ্বারা সম্ভব নয়। মুখ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদন করা যেতে পারে কেবল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা, কোরআন পাঠ, নামাজ ইত্যাদি। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে কলব দ্বারা মনে মনে জিকির করার কথাই বলা হয়েছে। আর মনের জিকিরই প্রকৃত জিকির। মনই স্মরণের স্থান। যেমন এক হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, অমনোযোগীদের মধ্যে বসবাসকারী একজন জিকিরকারী বিত্তশালীদের মধ্যে ধৈর্যশীলদের মতো। এই হাদিস দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জিকির দ্বারা অমনোযোগিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে এরই নাম জিকির বা আল্লাহর স্মরণ।

অমনোযোগীদের নামাজই মূল্যহীন। আল্লাহর স্মরণবিহীন তসবীহ, ক্বেরাত ধর্তব্যের বাইরে। অন্যমনস্ক হয়ে যে নামাজ আদায় করে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এতক্ষণ ধরে আমি কোরআন মজীদে উল্লেখিত জিকির সম্পর্কিত আয়াতসমূহের বিবরণ পাঠ করলাম। আর আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা এবং হাদিসসমূহ জেনে নিতে পারলাম। উল্লেখ্য, জিকির সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বহুসংখ্যক হাদিসও। হাদিসের সেই বিশাল ভাণ্ডার থেকে আমরা এখানে এখন কিছুসংখ্যক হাদিস উল্লেখ করতে চাই। উল্লেখ থাকে যে, হাদিসসমূহ ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করা হলো 'ফাযায়েলে জিকির' নামক গ্রন্থ থেকে।

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে এবং যে ব্যক্তি করে না– এই দুইজনের উদাহরণ– জীবিত ও মৃত। যে জিকির করে সে জীবিত এবং যে জিকির করে না সে মৃত। বোখারী, মুসলিম, মেশকাত, দুররে মানসুর।

ব্যাখ্যাঃ জীবন সকলের নিকট প্রিয় এবং মৃত্যুকে সকলেই ভয় পায়। রাসুলেপাক (সা.) এর বাণীতে বলা হলো জিকির যারা করে না, তারা দৃশ্যত জীবিত হলেও প্রকৃত অর্থে মৃত। তার জীবন বিফল, অর্থহীন। যেমন এক কবি বলেন– আমার হায়াতকে জীবন বলা যায় না। প্রকৃত জীবন তো তার, বন্ধুর সঙ্গে যার মিলন হয়েছে।

এই হাদিসে কলবের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে, তার দিল জিন্দা থাকে, আর যে জিকির করে না, তার দিল মরে যায়।

সুফীগণ বা কামেল পীরগণ বলেন, এখানে জীবিত বলে চিরস্থায়ী জীবনের কথা বলা হয়েছে। কেননা যারা ইখলাসের সাথে অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করে তারা কখনো মরে না, বরং পৃথিবী পরিত্যাগের পরও তারা জীবিতই থাকে। যেমন শহীদগণ সম্পর্কে কোরআন শরীফে সুরা বাকারায় ১৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلاَ تَقُولُوا لِمَن يُّقتَلُ فِى سَبِيلِ اللهِ اموَاتٌ – بَل اَحيَاءٌ وَلَكِن لاَّ تَشعُرُونَ

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা লিমাই ইয়ূকতালু ফী সাবীলিল্লা-হি আমওয়া-ত ; বাল আহইয়া-উওঁ ওয়ালা-কিল লা-তাশউরূন।

অর্থ: আল্লাহর পথে যাহারা নিহত হয় তাহাদিগকে মৃত বলিও না, বরং তাহারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পার না। বাকারা আয়াত ১৫৪। অনুরূপ

জিকিরকারীদের জন্যও মৃত্যুর পর এক প্রকার বিশেষ জীবন আছে।

সুরা আল-ইমরানে বলা হয়েছে–

وَلاَ تَحسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ اموَاتًا – بَل احيَاءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ.

উচ্চারণ ঃ ওয়া-লা তাহসাবান্নাল্ লাযীনা কুতিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি আমওয়া-তা; বাল আহইয়া-উন 'ইন্দা রাব্বিহীম ইউর্‌যাকূন।

অর্থঃ যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে কখনই মৃত মনে করিও না। বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের প্রভুপালকের নিকট হইতে তাহারা রিজিকপ্রাপ্ত। আল-ইমরান, আয়াত ১৬৯।

ইমাম তিরমিজি বলেন, আল্লাহর জিকির শুষ্ক হৃদয়কে সিক্ত করে। হৃদয়ে আনে নম্রতা। আর যখন ক্বলবে আল্লাহর জিকির থাকে না, তখন নফসের তপ্ততা ও কামনার আগুনে কলব এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুষ্ক (মৃতপ্রায়) হয়ে যায়– ইবাদত-বন্দেগী করতে চায় না। যেমন শুকনো কাঠকে বাঁকা করা যায় না। কেবল যায় জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেওয়া।

২. রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, যদি কোনো লোকের অনেক টাকা পয়সা থাকে এবং সে অনেক দান খয়রাতও করতে থাকে এবং এক লোক যদি আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকে, তবে জিকিরকারী ব্যক্তিই হবে উত্তম। দুররে মানসুর, তিবরানী।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর পথে ব্যয় নিঃসন্দেহে উত্তম। কিন্তু আল্লাহর জিকির অত্যুত্তম। সুতরাং ওই সকল বিত্তশালীরা কতোই না সৌভাগ্যবান, যারা আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার সঙ্গে আল্লাহর জিকিরও করে। এক হাদিসে আছে, আল্লাহর পক্ষ থেকেও বান্দার উপর প্রতিদিন সদকা খয়রাত করা হয়। প্রত্যেককেই তাদের যোগ্যতা অনুসারে কিছু না কিছু দেওয়া হয়। আর সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহর জিকির করার তওফিক (সামর্থ্য) লাভ। আর এক হাদিসে এসেছে, যে মৃত্তিকাখণ্ডের উপরে আল্লাহর জিকির করা হয়, সেই মৃত্তিকা তার সপ্তস্তরসহ অন্যান্য মৃত্তিকার কাছে গর্ব করে।

৩. নবীয়ে আখেরুজ্জামান (সা.) এরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশের পর পৃথিবীর কোনোকিছুর জন্য আক্ষেপ করবে না। আক্ষেপ করবে কেবল ওই সময়টুকুর জন্য, যে সময় অতিবাহিত হয়েছিলো আল্লাহর জিকির ব্যতিরেকে। তিবরানী, বায়হাকী, দুররে মানসুর।

ব্যাখ্যাঃ জান্নাতবাসীগণ যখন জিকিরের বিশাল বিনিময় স্বচক্ষে দেখবে, তখন

সঙ্গত কারণেই জিকিরবিবর্জিত সময়ের জন্য আক্ষেপ করতে থাকবে। উল্লেখ্য, মহান আল্লাহর এমন বান্দাও আছেন, যাঁরা আল্লাহর জিকির ছাড়া পৃথিবীবাসের কোনো অর্থই খুঁজে পান না। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রা.) তাঁর 'মোনাব্বেহাত' নামক পুস্তকে লিখেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে মুয়াজ (রা.) তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, হে আমার মহান আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া রাত ভালো লাগে না, তোমার ইবাদত ছাড়া দিন ভালো লাগে না, তোমার জিকির ছাড়া ভালো লাগে না পৃথিবী। তেমনি তোমার ক্ষমা ছাড়া আখেরাত ভালো লাগবে না। আর দীদার ছাড়াও ভালো লাগবে না জান্নাত।

৪. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এবং হযরত আবু সাঈদ (রা.) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আমরা রাসুলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন, যে জামাত মহান আল্লাহ তাআলার জিকিরে মগ্ন থাকে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে। আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবৃত করে নেয়। তাদের উপর অবতীর্ণ হতে থাকে সাকিনা। আর মহান আল্লাহতায়ালা (তাঁর নিজস্ব মজলিশে গর্ব প্রকাশ ক'রে) তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। দুররে মানসুর, হিসনে হাসিন, মেশকাত, তিরমিজি, ইবনে মাজা, মুসলিম।

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবু যর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) একবার বললেন, হে আবু যর! আমি তোমাকে মহান আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। এটাই সকল শুভপরামর্শের মূল। কোরআন পাঠ ও আল্লাহর জিকিরের মহিমা অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও। এর দ্বারা আসমানে তোমার আলোচনা হবে। আর এটা পৃথিবীতে হবে তোমার জন্য নূর। অধিকাংশ সময় নীরব থেকো। উত্তম উক্তি ব্যতীত বাক্য ব্যয় কোরো না। এতে করে শয়তান কাছে আসতে পারে না এবং পাওয়া যায় ধর্ম বিষয়ের সাহায্য। বেশী হাসাহাসি করো না। এতে গৃহ হয়ে যায় মৃতবৎ। আর চেহারা থেকে চলে যায় নূর। জেহাদ করতে থাকো। কেননা এটাই আমার উম্মতের বৈরাগ্য। সহায়-সম্বলহীনদেরকে ভালোবাসো। তাদের সঙ্গেই অধিক সময় অতিবাহিত করো। তোমার চেয়ে নিম্নস্তরের যারা, তাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো। তোমার উপরের স্তরের যারা, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ো না। এরকম করলে মহান আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতকে আর সমীহ করতে পারবে না। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করো, যদিও তারা তোমার সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন করতে চায়। হক কথা বলতে সংকোচ করো না, কারো কাছে তা তিক্তবোধ হলেও। আল্লাহর ব্যাপারে কারো তিরস্কারের ভয় করো না। নিজের দোষ দেখার ব্যাপারে এমনভাবে মশগুল থাকো, যেনো অন্যের দোষ দর্শনের ফুসরত না পাও। যে দোষ তোমার মধ্যে আছে, সে দোষে অন্যকে অভিযুক্ত করো না। হে

আবু যর! শুভব্যবস্থা গ্রহণের চেয়ে উত্তম কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই। অশুভ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা সর্বোত্তম পরহেজগারী। আর সদ্ব্যবহার তুল্য কোনো ভদ্রতা নেই। জামে সগীর, তিবরানী।

'সাকিনা' অর্থ শান্তি, গভীর প্রশান্তি, অথবা বিশেষ রহমত। ইমাম নববী বলেন, 'সাকিনা' এমন যার মধ্যে শান্তি, রহমত সব কিছু আছে এবং তা অবতীর্ণ করা হয় ফেরেশতাদের সঙ্গে।

এই হাদিসে যে সকল ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে, তারা এই বিশেষ কাজের জন্যই নিয়োজিত। অর্থাৎ যেখানে আল্লাহর জিকির হয়, সেখানে তারা সমবেত হয় এবং জিকির শুনতে থাকে। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে, ফেরেশতাদের একটি দল বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকে। জিকিরের মাহফিল দেখতে পেলে সঙ্গীদেরকে ডেকে বলে, এই যে, এদিকে এসো। তোমরা যা খুঁজছো, তা এখানে আছে। তারা ডাকে সাড়া দেয়। মাহফিলকে ঘিরে ফেলে। উঠে পড়তে থাকে একজন আর একজনের পিঠে– এভাবে উঠে যায় আসমান পর্যন্ত।

৫. রসুল (সা.) একবার সাহাবীগণের এক সমাবেশে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে তোমরা এখানে সমবেত হয়েছো? তাঁরা নিবেদন করলেন, আমরা আল্লাহর জিকির করছি। আর প্রকাশ করছি তাঁর প্রশংসা-প্রশস্তি-স্তব-স্তুতি এবং পবিত্রতা ও মহিমা-মাহাত্ম্য। তিনি দয়া করে আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন। এটা আমাদের প্রতি তাঁর সুবিশাল অনুগ্রহ। রাসুল (সা.) বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলো, তোমরা কি শুধু এজন্যই এখানে বসে আছো? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। আমরা আল্লাহর শপথ করেই একথা বলছি। রাসুল (সা.) বললেন, তোমাদের প্রতি কোনো মন্দ ধারণার কারণে আমি তোমাদেরকে শপথ করতে বলিনি। শুভসংবাদ শোনো.... এই মাত্র ভ্রাতা জিবরাইল আমাকে বলে গেলেন, মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনে তোমাদের বিষয়ে গর্ব প্রকাশ করছেন। মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ, মেশকাত, দুররে মানসুর।

ব্যাখ্যাঃ মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, গর্ব করার অর্থ– মহান আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন, দ্যাখো। এই লোকদেরকে দ্যাখো। তাদের সঙ্গে রয়েছে নফস ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না, শয়তানের শত্রুতা, কামনা বাসনা এবং বহুবিধ পার্থিব প্রয়োজন। এতদসত্ত্বেও তারা আমার জিকিরে মশগুল। শত প্রতিকূলতা তাদেরকে আমার জিকির থেকে পশ্চাদপসরণ করাতে পারছে না। তোমরা তো প্রতিকূলতাবিবর্জিত সৃষ্টি। তোমাদের জিকির তাই তাদের মতো মূল্যবান নয়।

৬. আমাদের রাসুল (সা.) বলেছেন, সাত প্রকার মানুষকে মহান আল্লাহতায়ালা আপন রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন ওই দিন, যে দিন তাঁর রহমতের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। এক. ন্যায়পরায়ণ সম্রাট। দুই. ওই যুবক, যে যৌবনে আল্লাহর ইবাদত করে। তিন. ওই ব্যক্তি, যার হৃদয় মসজিদলগ্ন। চার. ওই ব্যক্তিবর্গ, যারা পরস্পরকে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে, যারা আল্লাহর জন্যই মিলিত ও পৃথক হয়। পাঁচ. ওই ব্যক্তি, যাকে সুন্দরী কোনো নারী আহ্বান করে, অথচ সে বলে আমি মহান আল্লাহকে ভয় করি। ছয়. ওই ব্যক্তি যে এক হাতে সঙ্গোপনে দান করে এমনভাবে, তার অন্য হাত তা জানে না। সাত. ওই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর জিকির করে এবং তার দুই চোখ থেকে অশ্রু ঝ'রে পড়ে। বোখারী, মুসলিম, মেশকাত, তারগীব।

ব্যাখ্যা ঃ 'অশ্রু ঝ'রে পড়ে' অর্থ বিগত জীবনে কৃত গোনাহসমূহের কথা মনে হয়– সে কারণে ঝ'রে পড়ে অনুতাপের অশ্রু। আবার আবেগ-অনুরাগের আতিশয্যেও ঝ'রে পড়তে পারে চোখের পানি। অর্থাৎ ওই জিকিরকারীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে আল্লাহর ভয়ে ও ভালোবাসায়। অর্জিত হয় ইখলাস (বিশুদ্ধতা)।

সুফিয়ায়ে কেরাম হাদিসে বর্ণিত 'খালিয়ান' (নির্জনতা) শব্দটির অর্থ করেছেন দু'রকম– ১. নির্জনে জিকির ২. গাইরুল্লাহর চিন্তা থেকে মুক্ত কলবী জিকির। এটাই আসল নির্জনতা। বাইরের শত কোলাহলও এমতাবস্থায় কলবে প্রবেশ করে না (এটা নক্‌শবন্দিয়া তরিকার একটি বৈশিষ্ট)। এই তরিকার শায়েখগণ এর নাম দিয়েছেন 'খেলাওয়াত দর আনজুমান', অর্থঃ জনতার মধ্যে নির্জনতা।

এক হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহর ভয়ে রোদনকারী স্তন থেকে বের হয়ে যাওয়া দুধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ না করা পর্যন্ত জাহান্নামে যাবে না। আর এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহর ভয়ে যে ব্যক্তির চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়, কিয়ামতের দিন তার আযাব হবে না। অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, দুই প্রকার চোখের জন্য জাহান্নাম হারাম। এক প্রকার– আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী চোখ। অন্য প্রকার– কাফেরদের অনিষ্ট থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজতের জন্য জাগ্রত চোখ।

এক কবিতায় আছে–

'প্রিয়তমের স্মরণে সারারাত কেঁদে কাটানোই আমার কাজ। আর তাঁর ধ্যানে বিভোর হয়ে যাওয়াই আমার নিদ্রা'।

এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহর ভয়ে রোদনকারী, আল্লাহর পথে জাগরণকারী এবং অবৈধ বস্তুর প্রতি (যেমন বেগানা রমণী) দৃষ্টি দান থেকে বিরত চোখের

জন্য দোজখের আগুন নিষিদ্ধ। দোজখের আগুন নিষিদ্ধ ওই চোখের জন্যও, যে চোখ নষ্ট হয়েছে আল্লাহর পথে। আর এক হাদিসে এসেছে, নির্জনে আল্লাহর জিকিরকারী যেনো কাফেরদের বিরুদ্ধে একাই রুখে দাঁড়িয়েছে।

৭. রাসুলে আকরম (সা.) এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, বুদ্ধিমান লোকেরা কোথায়? মানুষেরা জিজ্ঞেস করবে, বুদ্ধিমান কারা? উত্তরে বলা হবে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর জিকির করতো। আর আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিনৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতো। আর বলতো, হে মহান আল্লাহ! তুমি তো এসকল কিছুকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। আমরা তোমার তসবীহ পাঠ করি। তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। অতঃপর তাদের জন্য একটি পতাকা প্রস্তুত করা হবে। তারা ওই পতাকার পশ্চাতে চলতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলবেন, যাও। চিরদিনের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করো। দুররে মানসুর।

প্রখ্যাত হাদিসবেত্তা হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম জিকিরের উপকারিতার বিষয়ে রচিত তাঁর ‘আলওয়াবিলুছ ছাইয়্যিব’ নামক গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। লিখেছেন, জিকিরের মধ্যে রয়েছে একশতটিরও বেশী উপকারিতা। সেখান থেকে চুয়াত্তরটি উপকারিতার কথা এখানে আমি উল্লেখ করলাম। যেমন–

০১. জিকির শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় ও তার শক্তি খর্ব করে।

০২. জিকির আল্লাহর পরিতোষ লাভের উপায়।

০৩. হৃদয়ের বিষণ্নতা দূর করে।

০৪. মনে আনে আনন্দ।

০৫. উজ্জীবিত ও প্রফুল্ল রাখে হৃদয় ও শরীরকে।

০৬. চেহারা ও অন্তরকে করে জ্যোতির্ময়।

০৭. উত্তম রিজিক আকর্ষণ করে।

০৮. জিকিরকারীকে প্রভাব ও প্রশান্তির পোশাক পরানো হয়। তাকে দেখলে সমীহবোধ যেমন জাগে, তেমনি জাগে ভালোবাসা।

০৯. হৃদয় ভরে দেয় আল্লাহর ভালোবাসায়।

১০. জিকিরের দ্বারা লাভ হয় মোরাক্বাবা (ধ্যানমগ্নতা) যা পৌঁছে দেয় এহসানের স্তরে।

১১. সকল বিষয়ে আল্লাহরই হন একমাত্র আশ্রয়স্থল।

১২. লাভ হয় আল্লাহর নৈকট্য।

১৩. খুলে যায় মারেফতের দরজা।

১৪. অর্জিত হয় আল্লাহর ভয়।

১৫. মহান আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন। যেমন বলা হয়েছে- فَاذْكُرُونِى اذكُرْكُمْ

উচ্চারণ ঃ 'ফাজকুরুনী আজকুরকুম' (তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো)। সুরা বাকারা আয়াত ১৫২। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে 'মান জাকারানি ফী নাফসিহি জাকারতুহু ফী নাফসী' (যে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি)।

১৬. দিলকে জিন্দা করে।

১৭. জিকির হচ্ছে ক্বলব ও রুহের আহার।

১৮. ক্বলবের মরিচা দূর করে দেয়।

১৯. দূর করে দেয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি।

২০. গাফিলতি বা অমনোযোগিতা দূর করে।

২১. বান্দা যে জিকির আজকার করে, তা আরশের চতুর্দিকে ওই বান্দার জিকির ঘুরতে থাকে।

২২. সুখের সময় যে জিকির করে, তার দুঃখের সময় মহান আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন।

২৩. জিকির আল্লাহর আযাব থেকে নাজাতের উসিলা।

২৪. জিকিরের কারণে সাকিনা অবতীর্ণ হয়।

২৫. জিকিরের বরকতে জবান গীবত, চোগলখুরী, অসত্য ও অনর্থক কথা থেকে নিরাপদ থাকে।

২৬. জিকিরের মজলিস হচ্ছে ফেরেশতাদের মজলিস।

২৭. জিকিরের বদৌলতে জিকিরকারীর সঙ্গী-সাথীরাও সৌভাগ্যবান হয়।

২৮. কিয়ামতের দিনে জিকিরকারীদের কোনো আক্ষেপ থাকবে না।

২৯. ক্রন্দনকারী জিকিরকারী কিয়ামতের দিনে আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে।

৩০. দোয়াকারীগণের চেয়ে জিকিরকারীদের অধিক প্রাপ্তি ঘটে। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন, আমার

জিকিরের কারণে যে দোয়া করার ফুরসত পায় না, আমি তাকে দোয়াকারীদের চেয়ে বেশী দান করি।

৩১. সবচেয়ে সহজ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও জিকির সকল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

৩২. আল্লাহর জিকির জান্নাতের ছায়াগাছ।

৩৩. জিকিরের জন্য যে প্রতিদান ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, অন্য কোনো আমলের জন্য সেরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর' এই দোয়া যদি কেউ দিনে একশত বার পাঠ করে, তবে তাকে দেওয়া হয় দশজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়ার সওয়াব, তার আমলনামায় লিখে দেওয়া হয় একশত নেকি এবং গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয় একশতটি। আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাজতে থাকে।

৩৪. নিজের কল্যাণের কথা ভুলে যাওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করে। রোধ করে ক্বলবের মৃত্যুকে।

৩৫. জিকির মানুষের অশেষ উন্নতি সাধন করে। যার ক্বলব জিকিরে জাগ্রত, তার নিদ্রিত অবস্থাও গাফেল রাত্রি জাগরণকারী অপেক্ষা উত্তম।

৩৬. জিকিরের নূর দুনিয়ায় সঙ্গে থাকে, সঙ্গে থাকে কবরেও। আর পুলসিরাতে চলতে থাকবে আগে আগে। রাসুল (সা.) এই নূরের জন্যই প্রার্থনা করতেন এভাবে– হে আমার মহান আল্লাহ! আমার মাংসে, অস্থিতে, চর্মে, পশমে, কানে, চোখে, উপরে, নিচে, ডানে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে নূর দান করো। আরো বলতেন, আমার আপাদমস্তক নূরে ভরপুর করে দাও।

৩৭. জিকির তাসাউফ শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলির মূল। সকল তরিকার পীর-মোর্শেদগণ এ ব্যাপারে একমত। যার জন্য জিকিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, তার জন্য খুলে গিয়েছে মারেফতের পথ।

৩৮. মানুষের অন্তরে এমন একটি কোণ আছে, যা জিকির ছাড়া অন্য কোনো কিছু দ্বারা পূর্ণ করা যায় না। হৃদয়ের পূর্ণ পরিসর যখন জিকিরে ভরে যায়, তখন ওই বিশেষ কোণটিও ভরপুর হয়ে যায় জিকিরের নূরে। তখন জিকিরকারী সম্পদ ব্যতিরেকেই হয়ে যায় সম্পদশালী। আত্মীয়-স্বজন ও জনবল ছাড়াই লাভ করে প্রভূত সম্মান। সাম্রাজ্য ছাড়াই হয়ে যায় সম্রাট। আর যে জিকির করে না, সে আত্মীয়-পরিজন, বিত্ত-সম্পদ ও রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও হয় লাঞ্ছিত ও অপদস্থ।

৩৯. জিকির বিক্ষিপ্ত বিষয়াবলীকে একত্র করে, একত্রকে করে বিক্ষিপ্ত। দূরবর্তীকে করে নিকটবর্তী, আর নিকটবর্তীকে ঠেলে দেয় দূরে। অর্থাৎ হৃদয়ের সকল অসৎভাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়ে অন্তরে আনে শান্তি ও মহান আল্লাহপ্রেম। দুর্ভাগ্যকে করে দূরবর্তী, আর নিকটে এনে দেয় সকল সৌভাগ্যকে।

৪০. জিকির হৃদয়ের ঘুম ভাঙায়। সতর্ক করে।

৪১. জিকির এমন একটি বৃক্ষ, যাতে ফল ধরে মারেফতের। সুফিয়ায়ে কেরাম ওই ফলকে বলেন হাল ও মাকামের ফল। জিকির যতো গভীর হবে, ওই বৃক্ষের শিকড় হবে ততো সুদৃঢ়। ফলও ধরবে বেশী।

৪২. জিকিরকারী মহান আল্লাহর সঙ্গী। যেমন মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন-

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوا

উচ্চারণ ঃ 'ইন্নাল্লাহা মায়াল্লাজীনাত্তাক্বাও' (মহান আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন)। সুরা নাহল, আয়াত ১২৮। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহতায়ালা বলেন 'আনা মাআ' আ'বদি মা জাকারানী' (আমি বান্দার সাথে থাকি, যতক্ষণ সে আমার জিকির করতে থাকে)। এক হাদিসে আছে, মহান আল্লাহ বলেন, আমার জিকির যারা করে, তারা আমার আপনজন। তাদেরকে আমি কখনোই আমার রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেই না। যদি তারা তওবা করে, তবে আমি তাদের বন্ধু হই। না করলে তাদের চিকিৎসক হই। গোনাহ থেকে তাদেরকে পবিত্র করার নিমিত্তে তাদেরকে দুঃখ-কষ্টে ফেলে দেই।

৪৩. জিকির ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়ার সমতুল্য। আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় তুল্য। আল্লাহর রাস্তায় নফসের সাথে জেহাদ করার সমান।

৪৪. জিকির শোকরের মূল। যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির আদায় করে না, সে আল্লাহর শোকরও আদায় করে না।

এক হাদিসে আছে, একবার মহাপ্রেমিক মুসা নবী (আ.) মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রিয় প্রভুপালক! তুমি আমার উপরে অসংখ্য এহসান করেছো। সুতরাং আমাকে এমন একটি পদ্ধতি শিখিয়ে দাও, যাতে আমি তোমার অত্যধিক শোকর আদায় করতে পারি। মহান আল্লাহ জানালেন, তুমি যতো বেশী আমার জিকির করবে, ততবেশী হতে পারবে

শোকর-গুজার। আরেক হাদিসে আছে, হজরত মুসা বললেন, কীভাবে তোমার মহামর্যাদার অনুকূল কৃতজ্ঞচিত্ততা প্রকাশ করবো? মহান আল্লাহ বললেন, তোমার রসনা যেনো আমার জিকিরে সদা সিক্ত থাকে।

৪৫. পরহেজগার লোকদের মধ্যে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা সব সময় জিকিরে মশগুল থাকে। কেননা তাকওয়ার শেষ ফল জান্নাত। আর জিকিরের শেষফল আল্লাহর নৈকট্য।

৪৬. দিলের মধ্যে এক ধরনের এমন কাঠিন্য আছে, যা জিকির ছাড়া অন্য কিছুতে নম্র হয় না।

৪৭. জিকির সকল রোগের চিকিৎসা।

৪৮. আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্বের মূল হলো জিকির। আর তাঁর সাথে শত্রুতার মূল-গাফলত।

৪৯. জিকিরের মতো নেয়ামত আকর্ষণকারী ও আযাব দূরকারী কিছু নেই।

৫০. জিকিরকারীদের সাথে আল্লাহর রহমত এবং ফেরেশতাবৃন্দের দোয়া থাকে।

৫১. জিকিরের জলসাসমূহ জান্নাতের বাগান।

৫২. জিকিরের জলসা ফেরেশতাদের জলসা।

৫৩. মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর জিকিরকারীদের বিষয়ে ফেরেশতাদের সমাবেশে গর্ব প্রকাশ করেন।

৫৪. সর্বদা জিকিরকারী হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৫৫. যাবতীয় আমলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জিকিরের জন্যই।

৫৬. সেই আমলই সর্বোত্তম, যার মধ্যে আল্লাহর জিকির থাকে। যেমন জিকিরময় নামাজ, জিকিরময় রোজা, জিকিরময় জাকাত, জিকিরময় হজ, জিকিরময় জেহাদ ইত্যাদি।

৫৭. হাদিস শরীফে এসেছে, একবার একদল দরিদ্র সাহাবী রাসুল (সা.) এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আমাদের প্রিয়তম রাসুল! বিত্তবানেরা তাদের বিত্তের কারণে হজ, ওমরা, জাকাত ও জেহাদের আমলগুলো করার সুযোগ পায়। এভাবে তারা পুন্যের দিক দিয়ে হয়ে যায় অধিক অগ্রগামী। রাসুল (সা.) বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি সহজ আমলের কথা বলে দেই। তোমরা নামাজের পর 'সুবহানাল্লাহ' 'আলহামদুলিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবর' বেশী করে পড়ো। তাহলে তোমরাও

পুন্যার্জনের ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকবে না।

৫৮. জিকির অন্যান্য ইবাদত পালনের সহায়ক। জিকির ইবাদতে আস্বাদ আনয়ন করে। সকল ইবাদতকে সহজ করে দেয়।

৫৯. জিকিরের কারণে সকল কষ্টদায়ক কাজ সহজসাধ্য হয়ে যায়। সকল মুসিবত দূর হয়ে যায়।

৬০. যত জিকির করবে, ততোই মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে। মনে আসবে শান্তি।

৬১. হজরত ফাতেমা তুয্ যোহরা (রা.) আটা পেষা, কুয়া থেকে পানি তোলা– এ সকল কষ্টকর গৃহকর্ম করতেন। তিনি রাসুল (সা.) এর কাছে এসকল কাজের জন্য একজন পরিচারিকা বা খাদেমা চেয়েছিলেন। রাসুল (সা.) তাঁকে রাতে শয্যাগ্রহণের প্রাক্কালে ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবর পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, এই আমল খাদেমা লাভ করার চেয়ে উত্তম।

৬২. পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণের জন্য শ্রম স্বীকারকারী সকলেই দৌড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে জিকিরকারীগণ রয়েছেন সকলের সামনে।

৬৩. জিকিরকারীদেরকে মহান আল্লাহ 'সত্যবাদী' বলেন। আর যাদেরকে মহান আল্লাহ সত্যবাদী বলেন, মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে কখনোই তাদের হাশর হতে পারে না।

৬৪. জিকির দ্বারা জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করা হয়। বান্দা যখন জিকির বন্ধ করে দেয়, তখন ফেরেশতাদের নির্মাণকর্মও থাকে বন্ধ। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, নির্মাণ কাজের খরচ এখনো এসে পৌঁছেনি। এক হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম' সাতবার পাঠ করে, বেহেশতে তার জন্য একটি সবুজ গম্বুজ তৈরী হয়ে যায়।

৬৫. জিকির দোজখের দিকের প্রাচীর। কোনো খারাপ আমলের কারণে দোজখ নির্ধারিত হলেও জিকির মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়।

৬৬. ফেরেশতারা জিকিরকারীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। হযরত আমর ইবনে আস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, বান্দা যখন 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি' বলে অথবা বলে 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' তখন ফেরেশতারা বলেন, হে মহান আল্লাহ! এই লোকটিকে মাফ করে দাও।

৬৭. কোনো পাহাড়ে বা প্রান্তরে আল্লাহর জিকির করা হলে তারা গর্ববোধ করে। এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে বলে, আজ তোমার উপর দিয়ে কোনো জিকিরকারী পথ অতিক্রম করেছে কি? পাহাড়টি হ্যাঁ বললে প্রশ্নকারী পাহাড়টি আনন্দিত হয়।

৬৮. অত্যধিক জিকির মুনাফিকি থেকে মুক্তিপ্রদায়ক। মহান আল্লাহ্ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, لاَ يَذْكُرُونَ اللهَ اِلاَّ قَلِيلا উচ্চারণ ঃ 'লা ইয়াজকুরূনাল্লাহা ইল্লা ক্বলীলা' (মহান আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে)। সুরা নিসা, আয়াত ১৪২। হজরত কা'ব আহবার (রা.) বলেন, যে বেশী বেশী জিকির করে, সে মুনাফিকি থেকে মুক্ত।

৬৯. জিকিরের স্বতন্ত্র স্বাদ আছে, যা অন্য কোনো আমলে নাই। অন্য কোনো ফযীলত যদি নাও থাকতো, তবুও জিকির ওই আস্বাদের কারণে হতো অনন্য।

৭০. পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী– উভয় স্থানে জিকিরকারীদের চেহারায় জ্বল জ্বল করে নূর।

৭১. যে ব্যক্তি পথে ঘাটে ঘরে বাইরে দেশে বিদেশে অত্যধিক জিকির করবে, কিয়ামত দিবসে তার পক্ষে সাক্ষ্যদানকারীদের সংখ্যা হবে অনেক বেশী। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا উচ্চারণ ঃ 'ইয়াওমাইজিন তুহাদ্দিছু আখবারাহা' (সেই দিন পৃথিবী তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে)। সুরা যিলযাল, আয়াত ৪।

রাসুল (সা.) এরশাদ করেন, জমিনের খবরা-খবর তোমরা জান কি? সাহাবীগণ তাঁদের অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। রাসুল (সা.) বললেন, কোনো স্থানে কোনো পুরুষ ও রমণী কিছু করলে, ওই স্থানের মাটি সে সম্পর্কে বলবে (ভালো-মন্দ যাই হোক না কেনো)। একারণেই বিভিন্ন স্থানে জিকিরকারীদের সাক্ষ্যদানকারী হবে বেশী।

৭২. জবান যতক্ষণ আল্লাহর জিকিরে রত থাকবে, ততক্ষণ মিথ্যা কথা, গীবত, বাচালতা এসব কিছু করতে পারবে না। দিলের অবস্থাও তদ্রুপ। হয় আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন হবে, না হয় মত্ত হবে মাখলুকের জিকিরে।

৭৩. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। জিকির ছাড়া অন্য কোনো কৌশল-বুদ্ধি, শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ক্বলব থেকে হঠানো যায় না। শয়তান তাড়ানোর একমাত্র অস্ত্র জিকির (ক্বলবী জিকির)।

৭৪. রাসুল (সা.) বলেন, প্রত্যেক জিনিসকে পরিষ্কার করার যন্ত্র রয়েছে, দিলের ময়লা পরিষ্কার করার যন্ত্র হলো আল্লাহর জিকির এবং আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জিকির অপেক্ষা অধিক কার্যকরী আর কিছুই নেই। এই হাদিস দ্বারাও জিকিরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

কেননা প্রত্যেক ইবাদত প্রকৃত ইবাদতে গণ্য হয় অন্তর পরিষ্কার থাকলে। অন্তরকে সর্বদা আল্লাহর সাথে সংযুক্ত রাখার নামই হলো আন্তরিক জিকির আর মানুষ যখন এই পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তার আর কোনো ইবাদত বাদ পড়তে পারে না। যেহেতু জাহেরী এবং বাতেনী সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অন্তরের অধীন। অন্তর যার সাথে মিলে যায়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তার সঙ্গে মিশে যায়। প্রেমিকের অবস্থার কথা কে না জানে? হজরত সালমান ফারসী (রা.) কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলো, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কী? তিনি বলেছিলেন, তুমি কি কোরআন পড়োনি? কোরআনে পরিষ্কার বর্ণিত আছে–

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা যিকরুল্লা-হি আকবারু। (আল্লাহর জিকিরই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ)। সুরা আনকাবূত, আয়াত ৪৫। সুতরাং জিকরে এলাহী হতে উত্তম আর কিছুই হতে পারে না। হজরত সালমান ফারসী (রা.) উপরোল্লেখিত আয়াতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। 'মাজালেছুল আবরার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এই হাদিস দ্বারা আল্লাহর জিকিরকে সদকা, জেহাদ এবং সমস্ত ইবাদত হতে এই জন্য শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে যে, আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর জিকির, আর বাকী সব ইবাদত হলো জিকির হাসেল করার উপকরণ। আবার জিকিরও দুই প্রকার। প্রথম মৌখিক জিকির, দ্বিতীয় আন্তরিক জিকির– এটাই শ্রেষ্ঠ জিকির। ফিকির ও মোরাক্বাবা একেই বলা হয়। ওই হাদিসের মর্মও এটাই, যেমন বর্ণিত হয়েছে, 'ফিকরাতু ছায়া'তান খইরুম মিন ইবাদাতি সিততিনা সানাহ' (এক ঘণ্টার মোরাক্বাবা ষাট বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম)।

'মুসনাদে আহমদ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আল্লাহর জিকির আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার চেয়ে সাতলক্ষ গুণ বেশী ফযীলত রাখে।

দরুদ শরীফ ছাড়া মহান আল্লাহতায়ালা কোন ইবাদতই কবুল করেন না।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন শরীফের সূরা আহযাব ৫৬ নং আয়াতে বলেন-

إِنَّ اللهِ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا

উচ্চারণঃ ইন্নাল্লা-হা ওয়া-মালাইকাতাহূ ইউসাল্লুনা 'আলান নাবিইয়ি ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূসাললূ আলাইহি ওয়া ছাল্লিমূ তাছলীমা।

অর্থঃ নিশ্চয় মহান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবী করিম (সাঃ) এর মহব্বত ও সম্মানে দরূদ ও সালামের মজলিশ করেছেন এবং অব্যাহতভাবে করতে থাকবেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবী করিম (সাঃ) এর সম্মানে ও মহব্বতে আদবের সাথে দরুদ ও সালামের মজলিশ কর।

হুজুর (সাঃ)-এর মর্তবা ও মর্যাদা কোরআন শরীফে স্পষ্ট বলা হয়েছে এবং স্বয়ং মহান আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাকুল হুজুরে দো-আলমের প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করে থাকেন এবং মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, যারা মহান আল্লাহ এবং রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও যেন নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করে। যেখানে মহান আল্লাহ এবং ফেরেশতাকুল নবীর ইজ্জতের নিমিত্ত তাঁর উপর সালাম পৌছিয়ে থাকেন সেখানে মোমিন বলে দাবিদার মুসলমানদের জন্য সেই নবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ না করা কি চরম বখিলী এবং ঈমানের দুর্বলতা নয়?

রহমাতুল্লিল আলামীন হুজুর (সাঃ)-এর উপর অধিক সংখ্যক দরুদ ও সালাম পাঠের ফজিলত এবং মর্তবা সম্বন্ধে আমরা হাদিস শরীফ থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করলাম ঃ-

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যে আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, মহান আল্লাহতায়ালা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।"

(মেশকাত ৮৬০ নং, মুসলিম শরীফ)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,– "যে আমার উপরে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে মহান আল্লাহতায়ালা তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করবেন, তার ১০টি গুনা মাফ করে দেয়া হবে, অধিকন্তু তার ১০টি

মর্তবা, মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে।"

(মেশকাত শরীফ ৮৬১নং নাসায়ী শরীফ)

হযরত ইবনে মাসুদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমায়েছেন, "কেয়ামতের দিন আমার নিকটতম সেই ব্যক্তি হবে যে আমার উপর অধিক দরুদ পাঠ করবে।"

(মেশকাত শরীফ ও তিরমিযী)

হযরত ইবনে মাসুদ (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "আল্লাহর কিছু সংখ্যক ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন যাঁরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে থাকেন এবং আমার উম্মতের সালাম ও দরুদ আমার নিকট পৌছিয়ে দেন।"

(মেশকাত, নাসায়ী ও দারেমী)

আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসুল (সাঃ)-কে তিনি বলতে শুনেছেন,– 'তোমরা আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে। নিশ্চয়ই তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছবে– তোমরা যেখানেই থাক না কেন।"

(নাসায়ী ও মেশকাত ৮৬৫ নং হাদিস)

এ প্রসঙ্গে বক্তব্য হল মহান আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ রাসুলের উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করে থাকেন– নবী (সাঃ) তাঁর উম্মতের দরুদ সালাম রওজা শরীফ হতে শুনতে পান এবং তার জবাব দিতেও তিনি সমর্থ– সে ক্ষেত্রে নবীর ইজ্জতের খাতিরে তাঁর প্রতি দরুদ সালাম প্রেরণের উদ্দেশ্যে মিলাদ পাঠ ও সম্মানার্থে কেয়াম না করা কি তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ নয়? এ হাদিসটাও উপরে বর্ণিত হাদিসকে সমর্থন করে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে আরও রেওয়ায়েত আছে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "অপমানিত হোক সে ব্যক্তি যার নিকট আমার নাম লওয়া হয় অথচ সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে না। অপমানিত হোক সে ব্যক্তি যার নিকট রমজান মাস আসে অথচ সে লোকের গুনা মাফের পূর্বেই রমজান মাস চলে যায় এবং অপমানিত হোক সে ব্যক্তি যার নিকট তার মা বাবা উভয়ে বা তাদের একজন বার্ধক্যে উপনীত হন অথচ তাঁকে তারা বেহেশতে পৌঁছায় না। অর্থাৎ, তাদের খেদমত দ্বারা সে ব্যক্তি বেহেশত লাভের উপযোগী হয় না।" (মেশকাত ৮৬৩ ও তিরমিযী)

হাদিসের সম্রাট আবু হোরায়রা (রাঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে আমার রওজা শরীফ এসে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে,

আমি তা সরাসরি শুনতে পারব। আর যে ব্যক্তি দূর হতে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে তাও আমার নিকট পৌঁছান হবে।" (বয়হকী, মেশকাত)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, মহান আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ তাঁর উপর ৭০ বার দরূদ পাঠ করবেন।" (আহমদ ও মেশকাত ৮৭৪ নং হাদিস)

উক্ত হাদিসের অনুবাদক তার ব্যাখ্যায় লিখেছেন, মহান আল্লাহতায়ালা নবীর উপর একবার দরুদ পাঠের পরিবর্তে ১০ বার রহমত বর্ষণের ঘোষণা করেছেন। কিন্তু হুজুরের উক্ত উম্মতের উপর মহান আল্লাহতায়ালা মহব্বত ও দয়া পরবশ হয়ে ওই ১০ গুণের পরিবর্তে অবস্থাভেদে ৭০ গুণ কিংবা তদাপেক্ষা বেশী ছোয়াব বা রহমত দান করতে পারেন।

ফাজালাহ বিন উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসুল (সাঃ) বসেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামাজ পড়ল (অতপর মোনাজাতে শুধু) বলল, "হে খোদা আমায় ক্ষমা কর, আমায় দয়া কর।" মোনাজাত শেষ করল কিন্তু নবীর উপর দরুদ পাঠ করল না। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে কিছু (বিরক্তি সহকারে) বললেন, "হে মুসুল্লী, দোয়াতো বড় তাড়াতাড়ি করলে। অতপর তাকে বললেন, যখন তুমি নামাজ আদায় করবে এবং দোয়ার জন্য বসবে তখন প্রথমে মহান আল্লাহতায়ালার গুণগান করবে। যার যোগ্য তিনি। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। ফাজলাহ বলেন, তারপর আর এক ব্যক্তি এসে নামাজ পড়ল, অতপর আল্লাহর গুণগান করল ও সব শেষে নবী (সাঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করল। তখন নবী (সাঃ) তাঁকে বললেন, "হে মুসল্লি এখন আল্লাহর নিকট তোমার প্রার্থনা কর তোমার প্রার্থনা কবুল করা হবে।"

(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও মেশকাত)

আবদুল্লা ইবনু মাসুদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি একদা নামাজ পড়ছিলাম। আর নবী করিম (সাঃ), আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) আনহুম তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমি (মাসুদ রাঃ) যখন দোয়া করতে বসলাম, প্রথমে আল্লাহর গুণগান করলাম, অতপর হুজুরের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলাম তারপর আমার নিজের জন্য দোয়া করতে লাগলাম। তখন হুজুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "প্রার্থনা কর, তোমাকে দেয়া হবে– প্রার্থনা কর, তোমাকে দেয়া হবে।" (তিরমিযী, মেশকাত ৮৭০ নং হাদিস)

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন, "সমস্ত প্রার্থনা ও দোয়া আসমান ও জমিনের মধ্যে শূন্যে অবস্থান করতে থাকে এবং কিছুই উপরে উঠে না। অর্থাৎ, আল্লাহর

দরবারে গৃহীত হয় না যতক্ষন না তোমার নবীর উপর দরুদ পাঠ করা হয়।"

(মেশকাত ও তিরমিযী)

উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহ হতে প্রমাণ হয় যে, দরুদ শরীফ দোয়া কবুলের শর্ত এবং মহান আল্লাহ তাঁর হাবীবের উপর দরুদ শরীফ পাঠ ব্যতীত আল্লাহর হুজুরে বান্দার মোনাজাত কবুল হয় না যার জন্য নামাজের শেষে তাশাহহুদ পাঠ করা ওয়াজেব হিসেবে ঘোষিত হয়েছে এবং আত্তাহিয়্যাতুর পর দরুদ শরীফ পাঠ সুন্নত এবং ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরজ।

রাসুল (সাঃ) এর পরবর্তী যুগে আউলিয়াগণ নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম সোপান বলে নির্দেশ করেছেন- যেহেতু মহান আল্লাহতায়ালা স্বয়ং তাঁর নবীর উপর দরুদ পাঠ করেন। এবং কোন মোমিন মহব্বতের সঙ্গে দরুদ পাঠ করলে মহান আল্লাহ তাঁর উপর খুশী হন। যেহেতু মহান আল্লাহ স্বয়ং বলেন দরুদ শরীফ পাঠ কারীর উপর একবারের পরিবর্তে ১০ বার রহমত বর্ষণ করা হয় এবং অবস্থাভেদে ৭০ বার ওই বান্দার উপর রহমত পাঠান হয়। এছাড়া স্বয়ং হুজুর (সাঃ) তাঁর সে উম্মতের উপর অত্যন্ত খুশী হন এবং তাঁর দোয়া আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়।

এ সমস্ত কারণে সমস্ত তরিকতের মাশায়েখগণ নবীর মহব্বত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নবীর উপর প্রতিদিন দরুদ শরীফ পড়া বাধ্যতামূলক করেছেন।

আমি আমার আশেকান জাকেরান ও অনুসারীদের দৈনিক ৭২২ বার দরুদ শরীফ পাঠ করিবার শিক্ষা দিয়ে থাকি। প্রথমে ফজর নামাজের পর পাককালাম ফাতেহা শরীফে ১১ বার দরুদ শরীফ, খতমে মোজাদ্দেদিয়া ২০০ বার দরুদ শরীফ, মাগরিবের নামাজের পর পাককালাম ফাতেহা শরীফে ১১ বার দরুদ শরীফ এবং বাদ এশা বিছানায় ঘুমাবার আগে ৫০০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করতে হয়। সব মিলিয়ে দৈনিক ৭২২ বার দরুদ শরীফ পাঠ করতে হয়।

দরুদ শরীফ পাঠ করিবার নিয়ম

"দালায়েলুল খায়রাত" কিতাবে উল্লেখ আছে, (১) দরুদ শরীফ পাঠকারীর শরীর, পোশাক এবং স্থান পবিত্র হতে হবে। অজুর সাথে দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে, তবে বে-অজু অবস্থায়ও দরুদ শরীফ পাঠ করা জায়েয আছে। (২) জায়নামাযে কেবলামুখী হয়ে বসে খালেছ দিলে মনোযোগ সহকারে শব্দ করে অথবা নিঃশব্দে দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে। (৩) মানুষকে দেখাবার জন্য যেন দরুদ শরীফ পাঠ করা না হয়, সেইদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। (৪) আর দরুদ শরীফ পাঠ করার সময় মনে মনে এ ধারণা করবে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে যেন দরুদ শরীফ পাঠ করছি। (৫) দরুদ শরীফ পাঠ করার সময় কারো সাথে কথা-বার্তা বলবে না এবং অপবিত্র স্থানে বসে দরুদ শরীফ পাঠ করবে না।

দরুদ শরীফ পাঠ না করার ক্ষতি

হাদিস : হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ পাঠ করতে ভুলে যায়, স্মরণ রাখিও সে ব্যক্তি জান্নাতের পথ ভুলে যাবে।

হাদিস : অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমায়েছেন- যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্যকারী ও আমার সুন্নাত ত্যাগকারী এবং আমার নাম শ্রবণ করতঃ দরুদ পাঠ ত্যাগকারী, তারা কেয়ামতের ময়দানে আমার সাথে সাক্ষাৎ লাভ করতে সক্ষম হবে না।

স্বপ্নে রাসুল (সাঃ)-কে দেখার দরুদ শরীফ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করবে, সে ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দর্শন লাভ করবে। আর যে মু'মিন ব্যক্তি হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নের মধ্যে দর্শন লাভ করবে, সে রোজ কেয়ামতে তাঁর শাফায়াত লাভ

করবে এবং দোযখ তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। দরুদ শরীফ এই-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ – اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسِيْلَتِى اِلَيْكَ وَاٰلِهٖ وسَلِّمْ–

উচ্চারণ ঃ আলাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়াসীলাতী ইলাইকা ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا عَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّىَ عَلَيْهِ*

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন্ কামা আমারতানা আন নুসাল্লিয়া আ'লাইহি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهُ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন্ কামা হুওয়া আহ্লুহু।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন্ কামা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الاَرْوَاحِ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা রূহি মুহাম্মাদিন্ ফিল আরওয়াহি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى الاَجسَادِ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা জাছাদি মুহাম্মাদিন্ ফিল্ আজছা দি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبرِ مُحَمَّدٍ فِى القُبُورِ*

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা ক্বাব্রি মুহাম্মাদিন্ ফিল্ কুবূরি।

-------:-------

প্রকাশনা সমূহ

কুতুববাগ দরবার শরীফের পীর ও মোর্শেদ শাহ্সূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নক্‌শবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ :

১. মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ 'সত্যদর্শন'

২. কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র 'মাসিক আত্মার আলো'

৩. খাজাবাবা কুতুববাগীর মহামূল্যবান নছিহত বাণী

৪. নিত্য দিনের 'অজিফা' আমল (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন)

৫. নামাজের ভেতরেই মহান আল্লাহর সাথে মে'রাজ বা দেখা হয়

৬. শানে কুতুববাগী

৭. শিরক ও বেদআত প্রসঙ্গে

দ্রষ্টব্যঃ আমাদের পরবর্তী প্রকাশনা খাজাবাবা কুতুববাগী রচিত বিশ্ব মানব জাতির উদ্দেশে কোরআন শরীফের তাফসির গ্রন্থ। এছাড়াও মহান মোর্শেদ কেবলা কোরআন-হাদিসের আলোকে নানান বিষয়ে গবেষণা অব্যহত রেখেছেন যা কিতাব আকারে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ হতে থাকবে।

বর্তমান জামানা অতি মছিবতের জামানা, জলে-স্থলে সর্ব জায়গায় শুধু গজব মছিবত আর মানুষের শুধুই চাওয়া, যার যতো আছে তার ততো বেশি চাওয়া, চাওয়ার কোন শেষ নেই। চাওয়ার তখনই শেষ হবে যখন সে ইন্তেকাল করবে বা এক্সপেয়ার হয়ে যাবে। শয়তান মানুষকে নানারকম প্রলোভন করে ঝানুপেতে বসে সর্ব সময় ভালো কাজ থেকে, নেকির কাজ থেকে দূরে রেখে মন্দ কাজের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ বা অচেতন মানুষ বুঝতে পারছে না যে- আমাদের মরণ, কবর, হাশর, মিজান, পুলসিরাত পার হতে হবে ও মহান আল্লাহতায়ালার আদালতে দাঁড়াতে হবে এবং সকল ভালো-মন্দের কর্মের হিসাব দিতে হবে।

হে পাঠকগণ! আপনারা চিন্তা করে দেখুন যে, আপনাদের অমূল্য জীবন স্বপ্নের মত চলে যাচ্ছে, হুঁশ করার দরকার আছে কিনা? মহান আল্লাহতায়ালা ও রাসূল (সাঃ) কে চেনার দরকার আছে কিনা? আপনারা যদি জামানার কামেল কোন মুর্শিদের সন্ধান পান অতি শীঘ্রই যেয়ে তার কাছে বাইয়াত, তালিম তালকিন ও শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে তাছকিয়ায়ে নফস বা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করুন। পবিত্র কোরআন শরীফে মহান আল্লাহতায়ালা সূরা আল-ফাত্‌হ ১০নং আয়াতে যা স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন।

কুতুববাগ দরবার শরীফ

সদর দপ্তর ঃ ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, ফোন ঃ ০১৭১৬-১২৮৫১৫, ০২-৫৮১৫৬৫২৮
শাখা-১ ঃ বন্দর, নারায়নগঞ্জ, শাখা-২ ঃ আহম্মদবাড়ী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
www.kutubbaghdarbar.org.bd, e-mail : info@kutubbaghdarbar.org.bd